শঙ্খ ঘোষ

জার্নাল

স্বত্ব : শঙ্খ ঘোষ

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৯২

দাম : কুড়ি টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা ৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার
টেকনোপ্রিণ্ট। ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন। কলকাতা ৬

জয় গোস্বামী

স্নেহাস্পদেষু

সূচি

১

এই মুহূর্ত ১৩ কবিতার ভাষা ১৫ বিশ্বাস-অবিশ্বাস ১৮ ভাস্কর ১ ২৩ ভাস্কর ২ ২৫ ভাস্কর ৩ ২৮ কবি ১ ৩১ কবি ২ ৩৬ আধুনিকতা ৩৮ পাঠক ৪৪ অরবিন্দ ৪৭ বৃষ্টি ৪৯ তুমি কোন্ দলে ৫৩ উপায় আর লক্ষ্য ৫৮ স্বপ্ন ৬৩ লেখা-না-লেখা ৬৭ স্তুতি নিন্দা ৭১ নেপথ্য ৭৩ সেতার ৭৬ প্রতীক্ষা ৭৮ বনভিলা ৭৮ কবিতাপড়া ৮০ কে কবি ৮১ জীবনচরিত ৮৪ চিঠিপত্র ৮৭ প্রাইজ ৯২ এপিক আর ট্র্যাজিক ৯৫ দাতারাম ৯৬ কোটাস্থর ৯৮ উদয়ন ১০০ বর্ষা ১০১ কালো সময় ১০২ অবসাদ ১০৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হঠাৎ ১০৬ অপ্রেম ১১১ মন ১১৪ প্রায়শ্চিত্ত ১১৫ দুঃখ ১১৭ প্রাকৃতিক ১১৮ পুলিনবিহারী আর শোভনলাল ১২০ শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ১২৩ আবৃত্তি-কথা ১২৬ রাধিকামোহন ১৩১ শৈলজারঞ্জন ১ ১৩৫ শৈলজারঞ্জন ২ ১৩৭ চীনে কবিতা আর রবীন্দ্রনাথ ১৪০ ভিক্টর ইউবুলিস ১৪৪ বক্তৃতা: ১ ১৪৭ বক্তৃতা: ২ ১৪৯ বই: লুকাচ ১৫২ বই: টলস্টয় অর সিনক্লেয়ার ১৫৬ উইল ডুরাণ্ট ১৬০ সান্ত্বনা ১৬৪ সর্বোচ্চ ১৬৭ আঘাত ১৭০ সৌন্দর্য ১৭২ মুখচ্ছায়া ১৭৩ মধ্যরাত ১৭৪

২

একদা অন্যদিন আরেকদিন ১৭৭ জীবনানন্দ : উত্তরাধিকার ১৮৫ জীবনানন্দ : গদ্যপ্রতিমা ১৯৪ কাফ্‌কার স্বপ্ন ২০৪ রিল্‌কে : মাল্টে থেকে এলিজি ২১৬

ভূমিকা

১৯৭৮ সালে, একবছরের শান্তিনিকেতন-বাসের সময়ে. প্রায় প্রতিরাতেই কিছু-না-কিছু লিখে রাখবার একটা অভ্যাস হয়েছিল। লিখবার সময়ে জানতাম সেগুলি নিভৃত এবং ব্যক্তিগত ; তাই, যখন-যেমন-খুশি লিখতে কোনো বাধা ছিল না একেবারেই। বছর শেষ হলো, খাতাও হলো শেষ। ফিরে এলাম কলকাতায়।

বছরখানেক পরে, কোনো-একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে যখন প্রতিশ্রুত গদ্যলেখা কিছুতেই লিখে উঠতে পারছি না অনেকরকম সংকটে, নিরুপায় দশায় শেষ পর্যন্ত সেই দৈনন্দিন জার্নাল থেকেই দুটি অংশের অনুলিপি করে দিতে হলো, কাজটাকে নিতান্ত অসংগত জেনেও। কিন্তু তার পর এই হলো যে নানা প্রান্তের ছোটো পত্রিকা থেকে প্রায়ই পৌঁছতে লাগল—কবিতার নয়, প্রবন্ধের নয়—ওইরকম জার্নালেরই দাবি। প্রবন্ধের বদলে জার্নালে এই আকস্মিক আগ্রহ কি এইজন্যে যে পত্রিকাগুলি ছোটো, জায়গা কম ? না কি এজন্যেও যে ভারি প্রবন্ধ পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন অনেকে ? কারণ যা-ই হোক, মুদ্রণের জন্য যা লেখা হয়নি তার নির্বাচিত অনেকটা অংশই মুদ্রিত হয়ে গেল এইভাবে, অক্ষমতার ফল হিসেবে।

ছিন্ন ছিন্ন মুহূর্তের এইসব ভাবনা আর অনুভব নিশ্চয় তুচ্ছ লাগবে পাঠকের কাছে, ঘনতা আর ধারাবাহিকতার অভাবে পড়বার আগ্রহও হবে না অনেকের। তা জেনেও বইটি ছাপানো হলো শুধু সেইসব অল্পবয়সীদের কথা ভেবে, যাঁরা অনেকসময়েই উৎসুক হয়ে জানতে চেয়েছেন : আরো কোথায় কোথায় ছাপা হয়েছে জার্নাল, কিংবা, কবে তা ছাপা হবে আরো। তাঁদেরই জন্য এই সংগ্রহ। ছোটো হালকা অলস অসংলগ্ন গদ্য যাঁরা একেবারেই পড়তে পারেন না, এ-বই তাঁদের জন্য নয়।

জার্নাল নয়, এমনও কয়েকটি লেখা যুক্ত রইল বইটির শেষাংশে। ওই লেখাগুলিও দস্তুরমতো প্রবন্ধ নয়, প্রবন্ধের বীজ মাত্র। এর অনেকগুলিই লেখা হয়েছিল আকাশবাণীর দশপনেরো মিনিটের কথিকা হিসেবে। ব্যক্তিগত টেপ থেকে বা বেতারজগৎ থেকে অনেক যত্নে সেগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন অলকানন্দা গুহ, তাপস বসু এবং তারাপদ আচার্য। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই জেনেও যে-অকৃপণ যত্নে বইটি প্রকাশ করলেন সুধাংশুশেখর দে, যে-কোনো লেখকের কাছে সেটা এক বিস্ময়ের আর আনন্দের অভিজ্ঞতা।

২৫ বৈশাখ ১৩৯২ শঙ্খ ঘোষ

এই মুহূর্ত

এই একটি মুহূর্ত চলে গেল, এটা কখনই ফিরবে না আর, মুহূর্তই মুহূর্তের শেষ। এ-ভাবনাটা একদিকে একটা শূন্যতা নিয়ে আসে ; ঠিক। কিন্তু এইটেই তো আবার সঞ্চারক ভালোবাসারও বোধ ? এইখানেই এটা শেষ, এ-কথা জানি বলেই নিঃশেষে পেতে চাই একে, কোনোখানে ফাঁক না রেখে, ভবিষ্যতের জন্য কিছু ফেলে না রেখে। আর তখন প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে উঠতে পারে সুন্দর। আনন্দে সুন্দর, বিষাদে সুন্দর।

এই মুহূর্ত কি ভবিষ্যৎ মুহূর্তের প্রতিশ্রুতি কোনো? না-ও হতে পারে তা। বরং ভেবে নেওয়াই ভালো যে এ-অবস্থান প্রতিশ্রুতিহীন। তুমি বসে আছো, কিংবা আছো কোনো কাজের মধ্যে, আর তোমার সামনে, তোমার সঙ্গে, কোনো বন্ধু, কোনো নিকটজন বা আত্মজন, এ-মুহূর্তে তার নিবিড়তার কোনো শেষ নেই, সে বলছে, তুমি বলছ, কবিতার ভাষায় যেন মনে হচ্ছে, 'জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো', কিন্তু তখনই তুমি মনে মনে জানো, অন্তত জানা ভালো যে এর শেষ আছে, এমন-কী পরের মুহূর্তটিই আসতে পারে বিপুল

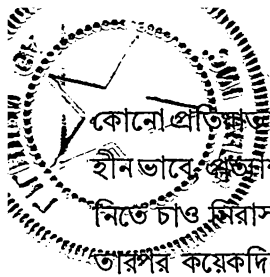

কোনো প্রতিক্ষা নিয়ে, অনন্বয় নিয়ে। তাই প্রতিশ্রুতি-হীন ভাবে, প্রত্যাশাহীন ভাবে, এই মুহূর্তটিকে তুমি ধরে নিতে চাও নিরাসক্ত কিন্তু কৃতজ্ঞ এক অঞ্জলিতে, আর তারপর কয়েকদিন কয়েকমাস কয়েকবছর পর তৈরি থাকো সেই মুহূর্তটির জন্য, যখন তোমার এই ছেলেবন্ধু বা মেয়েবন্ধু, তোমার এই নিকটজন বা আত্মজন, তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, চিনতে পারছে না তোমাকে, স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বিস্মরণে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান নিয়ে সরে যাচ্ছে তোমার সামনে থেকে। তখন কি তুমি মনে মনে একে ভাববে কোনো কৃতঘ্নতা ? কোনো প্রতিশ্রুতিলঙ্ঘন ? জীবনের অন্যায় ? কিন্তু কেনই-বা ? সে-মুহূর্ত তো এ-মুহূর্তের প্রস্তুতিপীঠ মাত্র নয়, তাই আজ এ-মুহূর্তের জন্য মিথ্যে হয়ে যায় না সেই মুহূর্তের আত্ম-সম্পূর্ণতা। প্রতিমুহূর্ত তার নিজের বিন্যাসে সম্পূর্ণ হয়ে আসে। এই আত্মসম্পূর্ণ মুহূর্তগুলির সম্পর্কের মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে—কোনো সমতা নয়—শুধু একটা সামঞ্জস্য খুঁজে বেড়ানো এই তো একটা জীবনব্যাপী কাজ।

একজন বন্ধু লিখেছেন সেদিন, জীবনানন্দের ভাষা তাঁর কাছে কোনো কিছুর বাহন নয়, না আবেগের না প্রজ্ঞার। ভাষাই না কি তাঁর সেই চৈতন্য যাতে 'নিখিল প্রপঞ্চের উদ্‌ভাস ঘটে'। আর তাঁর সমকালীন অন্য কবিদের ভাষা সামাজিক, বাচনিক, অর্থাৎ ভাষা দিয়ে তাঁরা 'কিছু একটা ব্যক্ত করেন'।

সত্যি কি জীবনানন্দের বিষয়ে বলা যাবে এতটা? এটা ঠিক যে অন্য অনেক কবির তুলনায় জীবনানন্দের ভাষায় তাঁর নিজস্ব গহনতার মুদ্রা খুব বেশি, এটা ঠিক যে সেই কারণে বক্তব্যটাই চেপে ধরে না ওঁর লেখাকে। কিন্তু তাহলেও, এও কি সত্যি নয় যে সে-ভাষা প্রকাশ করছে স্পষ্টই কোনো আবেগ বা ভাবনা, প্রজ্ঞা বা দর্শন? জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের কবিতা বিষয়ে তো এটা সত্য বটেই। সেই শেষ পর্বে, যখন তিনি লিখছেন '১৯৪৬-৪৭' বা 'মানুষের মৃত্যু হলে' বা 'অনন্দা'র মতো কবিতাগুলি, যেখানে সামাজিক দেওয়া-নেওয়ার ছবিটা অনেক প্রত্যক্ষ। এমন-কী প্রথম পর্বের কবিতাতেও আছে একটা

বেদনার তাপ, তার দাহ আর দর্শন খুব অস্পৃষ্ট থাকে না পাঠকের কাছে। দুচারটি কবিতা নিশ্চয় আছে এর ব্যতিক্রম হিসেবে, 'বিড়াল' বা 'ঘোড়া'র মতো কবিতা হয়তো-বা, কিন্তু সব নিয়ে বন্ধুর ওই ভাবনার সঙ্গে আমার মিলছে না ঠিক। কিছু-না-বলা উদ্ভাসের কিছু উদাহরণ আছে হয়তো শক্তির কবিতায়, আর নিশ্চয়ই উৎপলের 'পুরী সিরিজ'-এ। কিন্তু কেবল এই উদ্ভাস নিয়ে যে খুব বেশিদিন থাকা যায়, মন তা মানতে চায় না।

এ-রকম ভাবনার পিছনে কি কাজ করে মালার্মের কোনো ইঙ্গিত? মালার্মের শুদ্ধতম কবিতায় কবিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বক্তার আসন থেকে, এমন-কী আত্মপ্রকাশের রোম্যান্টিক ধারণা থেকে। বচনের ওপর ভর করে আছেন কবি (না, দেগার কাছে বলা সেই বহুচর্চিত বাক্যবন্ধের নজিরে বলছি না, বলছি তাঁর ভিন্ন এক সূত্রের কথা মনে রেখে, যার তাৎপর্য হলো 'শব্দের ওপর ভার দিয়ে দেন যিনি') বাচনের ওপর নয় : এই হলো মালার্মের কাব্যতত্ত্ব। ভাষা অসম্পূর্ণ, ভাষা অক্ষম, তার চুড়োটাকে দেখতে পাওয়া

যায় না কোথাও : এই হলো মালার্মের আক্ষেপ। কিন্তু এ-তত্ত্ব এ-আক্ষেপ দিয়ে জীবনানন্দে পৌঁছতে পারি না আমরা। মনে রাখা ভালো যে এক হিসেবে জীবনানন্দ রোম্যান্টিকতারই আধুনিক সম্প্রসারণ মাত্র। আত্মআবেগ থেকে ফিরে যাবার যে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের কথা ভাবছিলেন মালার্মে কিংবা এলিয়ট, তার কোনোটিরই সঙ্গে ওঁর সম্পূর্ণ মিল হওয়া শক্ত।

মনে পড়ে, মালার্মে বলেছিলেন কবিতার শব্দগুলি একে অন্যকে জ্বালিয়ে তোলে যেন বহুমূল্য পাথরের ওপর ঝলক। সেই ঝলকটাকেই তিনি সর্বস্ব ভেবেছিলেন বলে নিজেরই কবিতার লাইন বুঝতে চেয়েছিলেন অন্যের কাছে, বুঝে নিয়ে উত্তেজিতও হয়েছিলেন খুব। গ্যোয়টে যে একারম্যানকে লিখেছিলেন একবার 'একজন আমার কবিতার মানে বুঝতে চায়, যেন আমি নিজেই জানি তার মানে' সেটা হয়তো একটু ভিন্ন রকমের অভিমান। রবীন্দ্রনাথও বলতে চাইতেন ও-রকম। অথবা, হয়তো সত্যিকারের কবিমাত্রেই বলে থাকেন ও-ধরনের কথা। নেরুদা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, লোর্কা বিষয়ে লেখা তাঁর একটি কবিতার

কোনো শব্দবন্ধের তাৎপর্য বুঝতে চাইলে জিজ্ঞাসুকে বলেছিলেন তিনি : কোনো কবির কাছে তাঁর কবিতার মানে জানতে চাওয়া আর কোনো মহিলাকে তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করা একইরকম অভব্যতা।

অবশ্য, নেরুদা শেষ পর্যন্ত বলেওছিলেন সম্ভাব্য একটা মানে। গিন্‌স্‌বার্গের মতো উত্তেজিত হয়ে এর প্রতিবাদে সভার মধ্যে নগ্ন হবার উপক্রম করেননি। সভ্যতা বজায় রাখবারই একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন বলা যায়।

বি শ্বা স - অ বি শ্বা স

অশ্রুর প্রশ্ন, 'বাইরের দিকে মুখ করা' আর 'ভিতরের দিকে মুখ ঘোরানো' এই দুই ভাগে কবিতাকে সাজিয়ে নেবার কোনো যুক্তি আছে কি? দুটো কি প্রায়ই মিলে যায় না মহৎ কবিতায়? বাইরের অভিমুখে যে কবিতা, তার মধ্যে কি ভিতরের ক্ষরণ এসে মেশে না অনেকসময়ে?

কথাটা উঠেছিল 'গীতাঞ্জলি' নিয়ে আমার আলোচনা প্রসঙ্গে। অনেকসময়ে কেন, এতটাই বলা যায় যে ভিতরের সেই ক্ষরণ না থাকলে কোনো সময়েই কবিতা কবিতা নয়। কিন্তু শিল্প-সম্পর্কিত শ্রেণী-করণে কোনো কথাই কি পরমের অভিধায় বলা যায়, বলা হয়? 'গীতাঞ্জলি'র লেখাগুলি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন যে ও কেবল তাঁর নিজের জন্য লেখা, নিজেরই মনে কথা বলা—সেও তো কোনো পরম সত্য নয়, আপেক্ষিক শুধু। তা নইলে ছেপে-ছিলেন কেন সেই লেখা, সংকোচবশে হলেও? ও-রকম একটা পরিপাটি রূপের মধ্যে বাঁধছিলেন কেন কবিতা? কথাটা কেবল এই যে, সবটা মিলে এখানে ঝোঁকটা অনেক ভিতরের দিকে ঘোরানো, সামাজিকতা থেকে মুখ ফেরানো; এ-কবিতা ঘোষণাময় নয়, আহ্বানকারী নয়। তেমনি আবার আহ্বায়ক ঘোষক কবিতাবলির মধ্যেও হয়তো গোপন আত্মক্ষরণ ছড়িয়ে থেকে ভিতরে ভিতরে তাকে সজল করে তোলে, তাও নিশ্চয় সত্যি অনেক ক্ষেত্রে। প্রশ্নটা কেবল ঝোঁকের, প্রাধান্যের, পক্ষপাতের।

অশ্রুর দ্বিতীয় প্রশ্নটি বিশ্বাস নিয়ে। অবিশ্বাসীরও কেন ভালো লাগবে বিশ্বাসের কবিতা, সে-কথাটি স্পষ্ট করতে পারিনি আমি। পারিনি, কেননা মনে হয়, ওটা এক ভিন্ন ধরনের তর্ক।

প্রথমে ভাবা চাই বিশ্বাস-অবিশ্বাস বলতে সত্যিই আমরা কতটুকু বুঝি। এর একটা চলতি ব্যাখ্যা হচ্ছে আস্তিক্যবুদ্ধি আর নাস্তিকতার সংঘাত। অর্থাৎ তর্কটা হয়ে দাঁড়ায় ঈশ্বর বিষয়ে, আত্মার অবিনাশিতার বিষয়ে। কথাটা ছিল এই যে, এমন কোনো প্রশ্নের বাইরে দাঁড়িয়েও 'গীতাঞ্জলি'র মতো রচনার কোনো আস্বাদন সম্ভব কি না। যদি আমার হয়ে-ওঠার সঙ্গে আমার সত্তার নিরন্তর সংঘর্ষ, প্রতীক্ষা আর আহ্বানের সুর হিসেবে দেখা যায় ব্যাপারটাকে তাহলে ওই ধরনের আপাতধর্মীয় লেখার একটা ভিন্ন মাত্রা আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে হয়তো। যদি কেউ বলেন, না, সেভাবে পৌঁছয় না কিছু, তাহলে মৌন নিতে হয়। কিন্তু যদি সেটা অল্পমাত্রও ছুঁয়ে যায় কাউকে, তাহলে, তখনই, বলা যায় যে প্রশ্নটা আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের রইল না, হয়ে উঠল ধ্যান

আর ধ্যানহীনতার ! অর্থাৎ, যে-কোনো মানুষ একটু অন্তর্নিবিষ্ট হলেই being আর becoming-এর মুখোমুখি ছবি দেখতে পান, অপেক্ষমাণ পরিবর্তমান নিত্যজায়মান সম্পর্কের ছবি। এখানে আর অবিশ্বাস করব কাকে, যদি-না নিতান্ত মায়াবাদী হই, যদি-না ভাবি যে আমার অস্তিত্ব কথাটাই মায়া ! সে-রকম মানুষের বেলায় তো শিল্প ব্যাপারটারই কোনো মানে নেই, কাজেই শিল্প-প্রাসঙ্গিক এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো কথাই সেখানে উঠতে পারে না আর।

সন্দেহ হয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে অনেকসময়ে আমরা ভালোবাসা আর বিরাগের প্রশ্নটাকে এক করে ফেলি। আমার চারপাশে একটা জীবন চলছে, প্রকৃতি আছে, আমি আছি : এর মধ্যে কোনো অবিশ্বাসের ভূমিকা নেই। কিন্তু এর সবটাই কি একটা তাৎপর্যময় শুভ (অথবা, সুন্দর) উদ্দেশ্যের দিকে চলেছে, এদের মধ্যে কি পারস্পরিক নিবিড় কোনো যোগ আছে ? এইখানে এল বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তর্ক। বিশ্বাসী বলেন, হ্যাঁ ; অবিশ্বাসী বলেন, না। এই অর্থেই অবিশ্বাসী হওয়া মানেই কিন্তু প্রেমহীন হওয়া

নয়। এখানে হয়তো অনেকে জড়িয়ে ফেলেন সমস্যাটাকে, এই তো আমার মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ একসময় যেমন ভাবতে পারতেন যে বিশ্ব চলছে কোনো মহত্তর পরিণামের দিকে, আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তেমন ভাবতে পারি না। কিছুরই মানে নেই, আমরা কেউ কেউ হয়তো ভাবি। সঙ্গে সঙ্গেই কি আমরা সমস্ত অর্থেই অবিশ্বাসী হয়ে গেলাম? মনে তো হয় না। এর অনিবার্য ফল কি তবে এই হলো যে জগৎ ব্যাপারে একটা nausea বা বিবমিষা তৈরি হলো আমার? একেবারেই নয় তা। এই টুকরোটার বাইরে কিছু নেই। কিন্তু নেই বলেই যতদিন এই টুকরোটার মধ্যে আছি তত-দিন তার শিরায় শিরায় লিপ্ত হয়ে থাকার, পার-স্পরিক সম্পর্কগুলিকে আরো স্রোতোময় করে তোলার দায় আমাদের বেড়ে যায় অনেকখানি। অতিজীবনে বা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস আছে যাঁদের, তাঁরা বরং ভাবলেও ভাবতে পারেন যে পার্থিব এই সময়টা বয়ে গেলেও তো কত কিছু আরো বাকি পড়ে আছে দূরে। অনেক পরিমাণে তাই সরে যেতে পারে

দায়িত্ব, সরে যেতে পারে ভালোবাসাও, তাঁদের কারো কারো জীবন থেকে। অথবা, অনেকসময়ে সেই দায় বা ভালোবাসা থেকে যায় হয়তো একটা ভয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে, নীতির অনুষঙ্গ হিসেবে। কিন্তু যার ঈশ্বর নেই, যার লক্ষ্যে কোনো অতিজীবন নেই, সে যে ভালোবাসে বা দায় বহন করে, এ তো তার নিজেরই গরজ। আর কোথাও কিছু নেই বলেই তো এই সর্বস্ব সমর্পণ। ভয়ংকর শূন্যের মধ্যে আঁকড়ে থাকা এই ভালোবাসা কি সুন্দর নয়? তাই অবিশ্বাস মানেই অপ্রেম নয়। বরং অবিশ্বাসই জন্ম দিতে পারে সবচেয়ে বড়ো ভালোবাসার।

ভাস্কর ১

দিল্লী থেকে ফিরে এসেছেন শঙ্খ চৌধুরী, কিন্তু কয়েক-দিন আগের সেই উজ্জ্বলতা যেন কিছু মলিন হয়ে এসেছে। স্বাস্থ্যের কারণে? মনের অবসাদ? দুটোই হতে পারে। এই একজন মানুষের মধ্যে পাওয়া,

গিয়েছিল গোটা-মানুষের অনেকটা আদল, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে কী ধরনের মানুষ হবার কথা ছিল তার একটা নমুনা যেন। মন কেড়ে নেয় এঁর প্রাণখোলা সহজ হাসি, আক্ষরিক অর্থেই ফোয়ারার মতো উথলে ওঠা, আর সবচেয়ে মজা এই যে, হাসিটা প্রবলভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ওঁর শারীরিক দাপাদাপিতে। শান্তিনিকেতনকে আবাল্য ভালোবেসেছেন বলে একে বকাবকি করেন সব সময়ে, কিন্তু সেসব বচন গায়ে লাগবে এমন কেউ আর নেই বড়ো। এঁরা যখন রবীন্দ্রনাথকে আজও গুরুদেব বলে উল্লেখ করেন কিংবা নন্দলালকে মাস্টারমশাই—তখন ব্যাপারটা কতই স্বাভাবিক মনে হয়! কলকাতার পরিবেশে, অথবা আজকের দিনের অনেকের মুখে একে শোনাতে পারত নিতান্তই বানিয়ে-তোলা।

এঁদের কাছে গল্প শোনা যায় কীভাবে একসময়ে আকস্মিক উন্মাদনায় গান গাইতে গাইতে সদলবলে সব চলে আসতেন সেদিনকার ফাঁকা পূর্বপল্লীতে, গভীর রাত্রিবেলা। আর আজ, চারদিকে যখন বসতি ভরে গেছে, তখন, সন্ধে আটটায় চারদিকে নিঝুম রাত।

এ কি শুধু রাজনৈতিক হাঙ্গামার ফল? সেরামিক বিশেষজ্ঞ দেবীপ্রসাদ—এখানকারই ছাত্র ছিলেন আগে—জানতে চেয়েছিলেন জানুয়ারিতে একদিন, রাত নটায় কারো বাড়ি যাবার নিয়ম আছে কি না এখানে। সেদিন অবশ্য অভয়ে বলেছি নিয়ম না থাকলে ভেঙে দিন সব নিয়ম, হানা দিন যেখানে খুশি। কিন্তু তিনমাস পরে আজ হয়তো সে-কথা আমারও মুখ থেকে বেরোবে না সহজে।

ভাস্কর ২

কড়া নড়ে উঠল ভোরবেলায়। বেরিয়ে দেখি শঙ্খ চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর পিছনে প্রায় 'আমারকর্ডে'র ঘন কুয়াশা। চৈত্র শেষ হতে চলল, এই সময়ে এই কুয়াশা? ইরাদি আর আমরা দুই শঙ্খ (আশ্চর্য যে ওঁরও ডাকনাম শঙ্খ, পোশাকি নাম আলাদা) বেরিয়ে পড়েছি প্রান্তিকের দিকে তাল-গাছের সারির কাছাকাছি, কুয়াশা যেন উপর থেকে চাপ

খেয়ে নেমে আসছে নিচে, চুলে মুখে ভিজিয়ে দিচ্ছে অল্প অল্প। এটা তো শান্তিনিকেতনের নিত্য ব্যাপার নয়, আরো অনেক লোকজন কি বেরিয়ে পড়বে না আজ এই ভোরবেলায় ?

আরো বেশি ভালো লাগল আজ এই দম্পতিকে, শঙ্খ চৌধুরী আর ইরাদি। এই প্রবীণ বয়সেও ওঁদের ভালোবাসাটা অল্পবয়সীদের মতো সতেজ আর লাবণ্য-ময়, দুজনের পারস্পরিক বোঝাপড়াটা ভারি সুন্দর। সামান্য একটি শব্দ উচ্চারণ করলেই ইরাদি ধরে নিতে পারেন কী চান উনি, 'ইরা' নামটা উচ্চারণ করবার ধরনটাই যেন যথেষ্ট। মনে পড়ছে কদিন আগে শেখর একটি গল্প লিখেছে 'মাঝখান থেকে', বেশ জোরালো গল্প, সে-গল্পে আছে না-বলে কথা বোঝানোর এক বিপজ্জনক বিবরণ।

এটা কি বলা যায় যে ভালো লোকদের একটা বড়ো পরিচয় হলো তাদের ভালোবাসায় ? যে-দম্পতি পরস্পরকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে শিখেছে তারা জীবনের অন্য ছোটোখাটো ঈর্ষা সন্দেহ অথবা আত্মমদ থেকে অনেকটা দূরে থাকতে পারে নিশ্চয়ই ?

আর এইটেরই নাম তো আধ্যাত্মিকতা ? আধ্যাত্মিকতা এ ছাড়া আর কী ? পরিবেশকে পৃথিবীকে ভালো-বাসতে পারার মতো বড়ো মুক্তিও আর নেই কোথাও।

এ হয়তো-বা রাবীন্দ্রিক ভাবনা। কিন্তু রাবীন্দ্রিকই বা কেন ? জীবন নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন, তাঁরা অনেকেই তো বলবেন এ-রকম ? তেইয়ার দ্য শার্দ্যাঁর ছোটো একটি সংকলন পড়ছিলাম সেদিন : 'প্রেম বিষয়ে'। তার অনেক লাইন পড়ে কি রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে পড়ে না ? ওকাম্পোর যেমন রবীন্দ্রনাথ পড়তে গিয়ে মনে পড়েছিল—আরো অনেকের সঙ্গে—তেইয়ার দ্য শার্দ্যাঁর কথাও ? মেয়েদের মধ্য দিয়ে মানুষ যে তার বিচ্ছিন্নতা থেকে একাকিত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে, এ তো কেবল শার্দ্যাঁরই কথা নয়, এ তো 'রক্তকরবী'র রবীন্দ্রনাথেরও কথা, 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র বিশ্লেষণ অথবা তারও আগে ওঁর *Personality* বক্তৃতামালার নারীবিষয়ক লেখা। অন্য সব থেকে ছিন্ন করে নিয়ে, দুই-মানুষের জগৎ তৈরি করে নিয়ে যে যুগ্ম আত্ম-কেন্দ্রিকতা, তার উল্লেখ পড়তে গিয়ে মনে না পড়ে পারে না 'প্রাচীন সাহিত্য'র রবীন্দ্রনাথকে, প্রেমকে

যিনি মঙ্গলের ধারণায় বা আত্মোন্মোচনের ধারণায় পৌঁছে দিয়েছেন বারবার।

ভাস্কর ৩

কাল সন্ধেটা কাটল ভালো, তিন ভাস্করের কাছাকাছি। বলা যাক, অনেকখানি শরীরের কাছাকাছি, ঠিক হাওয়ায় ভাসা ব্যাপার নয়। এখানে চা খেতে খেতে শঙ্খ চৌধুরী যেমন বলছিলেন : আমার একটু কড়া দরকার, আমরা তো ভাস্কর, আমাদের একটু 'বডি' চাই।

রামকিংকরের কাছে যাওয়া গেল কাল, এতদিন পরে। শান্তিনিকেতন অল্পস্বল্প বেঁচে আছে এঁদেরই মধ্যে। এমন নয় যে রাবীন্দ্রিক কোনো ধরনের কিছু-মাত্র প্রশ্রয় আছে তাঁর চালচলনে, কিন্তু তাতে তো যায়-আসে না কিছু। মানুষ এখানে তার সর্বোত্তম বিকাশের মধ্যে মেলে ধরবে নিজেকে, এইটেকেই যদি বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে, তাহলে তার স্বাদ পাওয়া

যাবে আজও এ-রকম দুচারজনের মধ্যে। শোভনলাল, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকিংকর। এক হিসেবে এই তিন নাম একসঙ্গে উচ্চার্য নয়, কিন্তু সমাজসংসার মিথ্যে করে দিয়ে আপন মনে নিজের নিজের কাজ নিয়ে আছেন বলে এ-রকম কয়েকটি বিভোর নাম একসঙ্গে মনে পড়ে।

প্রায় কোনো আসবাব নেই রামকিংকরের, ছোটো ঘরখানিও যেন হা হা করছে। ময়লা একখানা চাদর-বিছানো চৌকি, দু'এক টুকরো পত্রিকা, ছোট্ট একটা অ্যালবাম, সিগারেট আর অ্যাশট্রে, চৌকির নিচে খালি কয়েকটা বোতল গড়িয়ে গড়িয়ে এ ওর গায়ে লাগছে, শব্দ হচ্ছে ঠুংঠাং এই হলো ছবি। কথা বলেন জড়ানো, খানিকটা নেশার ঘোরে থাকেন সব সময়েই, তাই অস্ফুট আর অসমাপ্ত বাক্যমালা, কী বলতে চান বুঝে নিতে হয় ঠারে ঠোরে, প্রবলভাবে যেটা বুঝিয়ে দেন সে হলো ওঁর উঁচু গলার হাসি। অস্পষ্ট সংলাপের মধ্যেও বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরাগ, নিজেকে নিয়ে কৌতুক আর শিল্পীর পরম ঔদাসীন্য। শঙ্খ চৌধুরী হয়তো জিজ্ঞেস করলেন:

কিংকরদা, আপনার সেই ছবিটা কী করে হারাল? কোথায় গেল? উত্তর: 'সেই ছবি? কোন্‌টা বলো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ছবি। কী হলো বলো তো? ছবি। ছবিটা····। আচ্ছা, সেই ছবি। ওটা বোধহয়, হ্যাঁ ওই যে কে একবার নিল! ভালো ছবিটা। আর দিল না। হা হা হা হা। সেই ছবিটা তো? ঠিক, ছবি।' তারপরে সিগারেট। আর তারপর অন্ধকারের মধ্যে বিরাট বিরাট করে এদিকে ওদিকে তাকানো।

এই হচ্ছে বডি।

সেখান থেকে অল্প সময়ের জন্য গেলাম শর্বরীর বাড়িতে, শর্বরী রায়চৌধুরী। অতীত থেকে ভবিষ্যতে। জরা থেকে যৌবনে। একইরকম ঘর এই পঁয়তাল্লিশ আস্তানার, ফরটিফাইভ কোয়ার্টার্‌স্‌, কিন্তু শর্বরীর ঘর একেবারে উলটো, ঠাসা তাঁর হাতের কাজে, মাটিতে, শেল্‌ফে, জানলার উপর। রেকর্ডপ্লেয়ার, টেপ। স্ত্রী, বাচ্চা দুটি ছেলে। হরেকরকম আলো, আসবাব। জরা থেকে যৌবন। কিংকরদার উলটো দিক।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে নষ্ট দিক। ইনিও আছেন কাজেরই মধ্যে মগ্ন। চালচলনও ঠিক গৃহস্থ

নয়, নিয়মবাঁধা সামাজিক নয়। কথা হলো অল্পই। বিদেয় করে দিলেন তাঁর সাঁওতাল মডেলকে। চালিয়ে দিলেন আমীর খাঁর টেপ। নিবিয়ে দিলেন বাতি। খানিকক্ষণ গান শুনে চা খেয়ে চুপি চুপি ফিরে এলাম আমরা অন্য আরেকদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ঘরের অগাধ অস্বস্তি ভেঙে দিচ্ছিল কেবল শর্বরীর বছর পাঁচেকের মজার ছেলেটি।

ক বি ১

ধরা গেল আজ অমিয়বাবুকে, ইম্ফল থেকে ফিরে এসেছেন কাল। কথা বললেন বিস্তর, এ-যাত্রায় দেখার মাত্রা অল্প হলো বলে বিলাপ করলেন কিছু, বর্ণনা করলেন মণিপুরের সৌন্দর্য, উদ্যম, সম্ভাবনা। সেইসঙ্গে ও-দেশের অশিক্ষা, সংস্কার, কূপমণ্ডূকতা। এল চীনেদের কথা, সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ। এলগিন রোডে প্রতিবেশী ছিলেন, কথা বলবার সুযোগ হতো রাজনৈতিক পথ-মত নিয়ে, সংকল্প ছিল তাঁর বীরের

মতো। কিন্তু সেটা মেনে নিয়েও অমিয়বাবুর ছিল গান্ধীর প্রতি প্রবণতা, তাঁর ধৈর্যের কাছে তিনি প্রণত। আজকের দিন যদি ব্যর্থ হয় তাহলেও আছে কাল, একশো গান্ধী যদি মিথ্যে হয় তবুও থাকে সত্য : এই ভাবনায় ছিল গান্ধীর জোর, ভাবছেন অমিয়বাবু। শিল্পীদেরও থাকা চাই এই সাহস, এই একাগ্রতা, এই তো তাঁর মনে হয়।

উঠল রবীন্দ্রনাথেরও কথা। কিন্তু এইখানে এসে আমার বিহ্বল লাগে একটু। কথাপ্রসঙ্গে এঁরা প্রায়ই বলেন কোথায় রবীন্দ্রনাথের বিফলতা বা আবদ্ধতার ইঙ্গিত, কিন্তু সেটা যে বলছেন তা ধরিয়ে দিলেই আবার পিছিয়ে যেতে চান কথা থেকে। এ কি কোনো ভয়? কিসের ভয়? অসম্মানের? হ্রস্ববুদ্ধি পূজাময় এই দেশের চরিত্র তাহলে পালটাবেন আর কারা?

স্নানের সময়ে গায়ে জল ঢালবার যে আনন্দ তার কথাও কেন লিখবেন না রবীন্দ্রনাথ, মৌখিক স্তরে এই হচ্ছে অমিয়বাবুর প্রশ্ন। চার পাশের জীবনটা ইন্দ্রিয়ময় হয়ে উঠে আসে না তাঁর কবিতায়, এই ওঁর অভিযোগ; এসব কথা বলতেন কবিকে,

অক্সফোর্ড থেকে পাঠাতেন আধুনিক কবিদের নিত্য-নূতন বইপত্র, কিন্তু সুবিধে হয়নি তেমন। চেষ্টা করেও পড়াতে পারেননি 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' অথবা এলিয়টের টুকরো কবিতাগুলি। 'ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন' দৈবাৎ ভালো লেগে গিয়েছিল। (ঠিক দৈবাৎ কি বলা যায়? মনে মনে ভাবি। 'ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন' বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে একটি মন্তব্য পাওনা আছে, অমিয় চক্রবর্তীর একাধিক চিঠির এমনি তাড়া থেকেই কি ছোটো সেই ভালো-লাগার মন্তব্যটি জানাননি রবীন্দ্রনাথ?) পারবেন কি রবীন্দ্রনাথ স্পেণ্ডারের মতো 'এক্সপ্রেস ট্রেন' নিয়েও লিখতে? লিখেছিলেন বটে 'ইসটেশন' ('ইসটেশন' না 'রাতের গাড়ি'?) 'নবজাতক' বইটিতে, কিন্তু, অমিয়বাবু স্নেহ-ভরে বলেন : ও হয়নি কিছু।

'শিশুতীর্থ'র ভাবনা এসেছিল নবজাতক সেমন্তীকে দেখে, হৈমন্তী দেবীও মানলেন এই কথা। সেমন্তীর জন্ম ১৯৩০ সালের ১৩ মে। রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখেছিলেন দুদিন বয়সে আর ফিরবার পথে বারবারই বলেছিলেন ওই শিশুটিকে দেখে তাঁর আনন্দের কথা, মা-র কোলে

শিশুর আশ্চর্য মূর্তিটি। এই না কি কবিতাটির সূচনা। কিন্তু কেমন করে বুঝব আমরা সে-কথা? লেখা যে শুরু হলো এর ছমাস পর, জার্মানির এক প্যাশান প্লে দেখে, সেও তো অমিয়বাবুরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! ঠিক সেই মুহূর্তেই তো দেশে তিনি চিঠি লিখছিলেন তাঁর সে-অভিজ্ঞতার বিবরণ জানিয়ে?

বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি রবীন্দ্রভবনের পথে। মাথায় একটি টোকা দিয়ে নিয়েছেন অমিয়-বাবু, মাঠ ভেঙে চলেছেন, অবশ্য মাঠ বলতে যদি কিছু আর থেকে থাকে এখনো। ওই টোকা পরেই হয়তো-বা তিনি ফিরে পাচ্ছেন তাঁর পুরোনো দিনের স্মৃতিগুচ্ছ।

বলছেন, হপকিন্সের কবিতা থেকে সরাসরি তিনি নেননি কিছুই। সচেতনভাবে ভাবতেই চাননি এসব নিয়ে। কিন্তু পড়েছেন তো? পছন্দ করতেন তো? হপকিন্সের রিদ্‌ম্‌ নিয়ে কি ভাবেননি কখনো? সেটা যে ভেবেছেন তা অবশ্য মানলেন। ভাবনার লজিকটা স্পষ্ট থাকে না, এরই উত্তরে ঝাঁপ দিয়ে উনি চলে এলেন আধুনিক কবিতায় শব্দ-ব্যবহারের প্রসঙ্গে।

পাউণ্ডের কাছে ইয়েট্‌স নাকি বলেছিলেন কোনো গরু-মহিষের 'moderate ears'-এর কথা। কথাটা অবশ্য ব্যবহার করেছিলেন ডরোথি ওয়েলেসলি, এই মুহূর্তে উনি হয়তো খেয়াল করতে পারছেন না সেটা। এ নিয়ে ইয়েট্‌সের কিছু উচ্ছ্বাস আছে 'অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্স'-এর ভূমিকায়। অমিয়বাবু বলছেন : 'দেখুন এঁদের মনটা কীভাবে কাজ করে। ears-এর আগে কি moderate কথাটা আসত কারও মাথায়? ওই এল একরকম! পাউণ্ড অবশ্য বললেন, আপনার এসব অলংকরণ ছাড়ুন, সোজাসুজি বলুন। হ্যাঁ, হপ-কিন্সের ছন্দে কিছু ছিল বৈ কি। অনেকসময়ে ছন্দ রাখতে গিয়ে কথাটা ছেড়ে দেওয়া হয়—কিন্তু ছাড়ব কেন? সেজন্য ছন্দ যদি একটু টাল খেয়ে যায় তো যাক না।'

হয়তো অমিয়বাবু বুঝতে পারছিলেন না যে তিনি নিজেরই কথা বলে চলেছেন; নিজের শব্দ-ব্যবহারের, নিজের ছন্দব্যবহারের কথা। হয়তো বুঝতে পার-ছিলেন না যে তাঁর ছোটো ছোটো বাক্যে, অনেক-সময়েই ক্রিয়াপদহীন, তাঁর শব্দে আর স্পন্দে, আমি

শুনতে পাচ্ছিলাম তাঁর কাব্যছন্দেরই এক অনায়াস উৎস। আশা করি এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন যে আমাদের পাশ দিয়ে বেশ কয়েকটি গরু হেঁটে গেল তাদের moderate ears নিয়ে!

ক বি ২

খুব ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক লাগছিল আজ অমিয়বাবুকে, অশীনের বাড়িতে বিদায়ী চায়ের আসরে। কাল ফিরে যাচ্ছেন ওঁরা। মনটা হঠাৎ একটু খারাপ লাগে আমার। ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তো মাত্র এই কটা দিনের, এমনও নয় যে মনে-মনে একই আমাদের প্রবণতা, জীবন-ব্যবহারে ওঁর রীতিধরন আমাকে বরং প্রহতই করে অনেকসময়ে, তবুও কেন এত মনখারাপ? সে কি এই-জন্যে যে সামান্য খানিকটা রবীন্দ্রউত্তাপ সরে যাচ্ছে সামনে থেকে? এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথের এতটা কাছে ছিলেন, এত নির্ভর ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের, সেইটেই কি আমি ছুঁতে চেয়েছিলাম ওঁর সান্নিধ্যে, সাধ্যমতো?

হয়তো দ্বিতীয় একটা কারণও আছে। যা-ই উনি লিখুন না কেন, যে-কথাই বলুন না কেন, সামনে গিয়ে বসলে মনে তো হতো একজন কবির সামনে বসেছি। নানাসময়ের কবিতার টুকরো টুকরো লাইন যেন ঘিরে আছে ওঁকে বলয়ের মতো ; আমি যে কেবল প্রাত্যহিক মূর্তি দেখছি একটা, এমন তো নয়। কথাগুলি শুনছি যেন সেই বলয়ের ভিতর থেকে, কবিতার তাপ পেতে পেতে। এই মুহূর্তে কতটা বলছেন উনি, তাতে কী এসে যায়।

এটা আশ্চর্য—অথবা হয়তো আর আশ্চর্যেরও নয়—যে, শান্তিনিকেতনে আজ শিল্পকাজ অথবা সৃষ্টি-কাজের ব্যাপারটা হয়ে উঠছে অনেক দূরের, তার কোনো প্রশ্রয় বা মূল্য থাকছে না এখানকার ব্যাপ্ত সামাজিকতায়। নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রাম-কিংকরের শান্তিনিকেতনও ক্ষীণ হয়ে এল। সদর্থে এখন কেবল প্রশ্রয় হতে পারে এখানে গবেষণার, জ্ঞানের ; তথ্যের আর তত্ত্ববিচারের। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ নিয়মবিহীন কিছু করবার ইচ্ছে হবে না কারও ? কেবল সৃষ্টির আনন্দে মশগুল হয়ে থাকবার স্বাধীনতা ?

মিথ্যে একটা সাজানো আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে সহজ সৃষ্টির কথা শুনতে। হয়তো সেইজন্যেও এমন একজন কবির সান্নিধ্যে ভালো লাগত মনটা, হয়তো সেইজন্যেই এই বিদায়কে এতটা বিদায় বলে মনে হয় আজ!

আ ধু নি ক তা

শিল্পের আধুনিকতা কাকে বলে, এ নিয়ে লেখা হয়েছে বিস্তর, কিন্তু সর্বমান্য কোনো ধারণা গড়ে উঠেছে কি না সন্দেহ। রোম্যান্টিকতা অথবা প্রতীক-বাদ কিংবা বাস্তববাদ যেমন এক-একটা বিশেষ সংজ্ঞার্থ বইতে পারে, আধুনিকতা কি শেষ পর্যন্ত সে-রকম কোনো-একটা 'বাদ'? অর্থাৎ, এ কি বলা যায় যে আধুনিক ব্যাপারটা এখন পুরানো হয়ে গেছে? না কি এড়িয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কালের হিসেবেই ফিরে আসতে হবে? তুল্যমূল্য হয়ে যাবে সাম্প্রতিক আর আধুনিক?

যুগোস্লাভিয়ার মার্ট অবশ্য বলেছিল একবার যে এটা কবিদের ভাববার বিষয় নয় মোটে, ওসব ভাবুক অধ্যাপকেরা। লেখার সময়ে কবি নিশ্চয় ভাবেন না, সে-কথা, তিনি লেখেন তাঁর নিজের গরজে যা-খুশির তাড়ায়। কিন্তু অন্য কারো লেখা পড়তে গিয়ে যদি তিনি রায় দেন যে সেটা আধুনিক লাগছে না একেবারেই, তবে কী অর্থে বলেন তিনি কথাটা? এমন তো নয় যে এ নিয়ে বলেননি তাঁরা কেউ, কবিরা বরং অনেকসময়েই এর উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন একটা, কিন্তু এমন কোনো উত্তর পাওয়া শক্ত যার আধারে সমস্ত আধুনিক লেখাকে একত্রে ধরা যায়। বিষ্ণু দে-র হিসেবকে গণ্য করলে জীবনানন্দ আধুনিক নন, জীবনানন্দের হিসেবে হয়তো নন অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তীর কি কোনো হিসেব আছে? কথায় অন্তত বলছিলেন সেদিন বিকেলে কোনো মানে নেই এর, কেবলই বদলে যায় এর তাৎপর্য, কী করে বলব কাকে বলে আধুনিক।

ফ্রস্ট উত্তর দিয়েছিলেন এক জিজ্ঞাসুকে: আধুনিক মানুষকে যিনি তাঁর কথা শোনাতে পারেন তিনিই

হলেন আধুনিক কবি, কবে তিনি বেঁচে ছিলেন সেটা বড়ো কথা নয়। তবে যদি আধুনিক কালে বেঁচে থেকেই সে-কাজ করে থাকেন, তাহলে তিনি আরো বেশি আধুনিক।

কিন্তু এ তো শুধু কথার খেলা। এ থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? আধুনিক মানুষ বলব কাকে? সেটাই যদি বলা হতো তাহলে তো এত ঘুরিয়ে বলতেই হতো না কথাটা। এটা কি সচেতন ভাবেই এড়িয়ে যাওয়া, না ভাবনারই একটা জট? অনেক ভারি আলোচনার মধ্যেও এই চক্রকদোষটা নজরে আসে বলেই মনে হয় যে ফ্রস্টও হয়তো অচেতনেই তার কবলে পড়েছিলেন।

একটা হয়তো বলা যায় যে দ্বিধাপন্ন মানুষের আর সমাজের নির্যাস (essence)-টাকে তুলে ধরাই আধুনিকতার চরিত্র। এর মধ্যে লুকোনো আছে একটা বিরুদ্ধাচরণের জোর, একটা প্রতিবাদের নিশ্বাস। একই সঙ্গে হ্যাঁ আর না-এর প্রতিঘাত জড়ানো থাকে সেই লেখার মধ্যে। বলছি না যে এর ফলে অমঙ্গল বা evil-টাই সর্বস্ব হয়ে ভাবনার -কাঁধ চেপে বসবে। হতে পারে যে সেই অমঙ্গলকে

অতিক্রম করে যাবার বিশ্বাসেই একজন হয়ে উঠছেন আধুনিক। কেবল বলতে চাই, তাকে লক্ষ্যে নিতে হবে, আধুনিক সমাজে তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই কোনো। এলিয়টকে পোড়ো জমি আর ফাঁপা মানুষের কবি হিসেবে চিহ্নিত করাই তো যথেষ্ট নয়, গভীরতর এক ধর্মীয়তার দিকেই তো এগোচ্ছিলেন এলিয়ট? সেই ধর্মের জন্য কি অনাধুনিক হয়ে যান তিনি? অন্যপথে, ধরা যাক কেউ যদি এই বহমান জীবনের অমঙ্গলের তালিকা তৈরি করেন বিধিমতো, কেবল তাহলেই কি তিনি আধুনিক?

সেইজন্যে জোরটা আসলে 'অমঙ্গল' শব্দের ওপর ততটা নয়, তাঁদের যৌবনে যেমন ইয়েট্‌সরা একদিন ভেবেছিলেন। জোরটা মনে হয় essence নামের ওই অস্পষ্ট শব্দটার ওপর, এইরকমই তো মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় সমকালীন সমাজের কিছু ব্যাধিচিত্র আছে। কিন্তু সে-লেখা কেন আমাদের চেপে ধরে না সেই তীব্র মুঠোয়, যেমন হয়তো ধরতে পারে জীবনানন্দের কোনো কোনো কবিতা? তার উত্তর এই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাগুলিতে

ধমনীর মধ্য থেকে সেই সারাৎসারটা আসে না, হয়ে থাকে যেন কিছু শারীরিক চিহ্ন।

এর সঙ্গে আরো একটা কথা আছে নিশ্চয়। আধুনিকতার একটা মস্ত দিক তার রূপে, রূপায়ণে। তরল বিস্তারে নয়, আধুনিকতার প্রকাশ হতে চায় সংহতির ঘনতায়, দিব্য এক কার্পণ্যে। তখন আর তালিকার দরকার করে না। বিক্ষত লড়াইয়ের ছবিটা আপনিই জেগে ওঠে রচনার ছোটো অবসরে। শেষ দশ বছরের অনেক কবিতার তুলনায় 'গীতাঞ্জলি' যে তার আপাতধর্মীয়তা নিয়েও আমাদের ছুঁতে পারে বেশি, এই হচ্ছে তার কারণ। অন্যরকম ভাবে, ওরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছুঁয়েছিলেন এক আধুনিকতাকে—অবিশ্বাসের নয়, বিশ্বাসের আধুনিকতাকে—পরবর্তী কবিতায় যা অনেক শিথিলতায় গড়িয়ে গেছে অনেক সময়ে, যা কেবল থেকে গেছে তাঁর গানে, শেষ দুতিন বছরের কিছু কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের গান যে তাঁর কবিতার চেয়ে বেশি টানে অনেককে, কেবল সুরই তার কারণ নয়, হয়তো এই আধুনিকতাও তার একটা কারণ। সে-আধুনিকতা একদিকে যেমন এর ঘন

গড়নের মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি এজন্যেও যে তাঁর গানে প্রায়ই মিলে আছে এক আমি আর না-আমির জটিল টানাপোড়েন।

তবে এই সংহতি আর জটিলতার পরিণতি যা হতে পারে, সেখানে আধুনিক হয়ে ওঠে নিবিড়ভাবে ব্যক্তিগত, এমন-কী সামাজিক কথা বলতে গিয়েও তার চালটা হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিগত মনীষার। সেইজন্যে কমিউনিটির সঙ্গে তার সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়ায় আড়া-আড়ি রকমের। মালরো একবার লিখেছিলেন যে, রাশিয়ায় গিয়ে স্ট্যালিনের ছবি আঁকতে হলে পিকাসোকে বর্জন করতে হতো তাঁর নিজস্ব সব পদ্ধতি, এমন-কী গ্যের্নিকার পদ্ধতিও, যেতে হতো তাঁর নিজের বিরুদ্ধে। এই নিজের বিরুদ্ধেই কি যেতে চাইছে না আজকের পৃথিবী? মনীষার ব্যাপ্তি বা অবচেতনের উৎসার যে আধুনিকতার ভিত্তি, সে কি অনেকটা ধ্বসে পড়ছে না আজ? আধুনিক যুগ কি আধুনিকোত্তর এক যুগে পৌঁছচ্ছে না এখন, অন্তত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে? সে-হিসেবে হয়তো বলা যায় যে এই 'আধুনিকতা'ও এক সীমাবদ্ধ—dated—ধারণা।

বাঃ, এই নিয়ে তো একটা লেখাও যায়! যায় তো যায়; এখন রাত হয়েছে অনেক, হাওয়াও দিচ্ছে ভালো, এখন ঘুমোনো যায়।

পা ঠ ক

কথা উঠেছিল, সেই পুরোনো কথা, আধুনিক কবিতা কেন পড়ে না কেউ, কেন আধুনিক কবিতার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক এত বিমুখতার।

কিন্তু কেবল আধুনিক কবিতার সঙ্গেই কি? সমস্ত কবিতারই সঙ্গে কি নয়? প্রশ্নটা বোধ্যতার নয়, প্রশ্নটা পাঠ্যতার। যে পাঠক স্বভাব থেকেই কবিতা পড়তে চান, তাঁর সমস্যা একরকমের। সেখানে ওঠে বটে দুর্বোধ্যতার কথা, আর তা নিয়ে আলোচনা হয়েওছে অনেক! কিন্তু এইটে অনেকসময়ে চোখ এড়িয়ে যায় যে, অনেকেই আমরা জানি না আমাদের মৌলিক কবিতা-বিমুখতার পরিমাণ। অনাধুনিক বা আধুনিকের প্রশ্ন নয়, যে-কোনোরকম কবিতার দিকে এগোতে

চাইবার যে তাড়না বা ইচ্ছে, সেইটেই সচরাচর ঘটে না অনেকের, ঘটবার কথাও নয়। যে-কোনো কবিতাই (যদি তা কবিতা হয় অবশ্য) তো আত্মিক? হেগেল লিখেছিলেন সেকুলারাইজেশন অব দি স্পিরিচুয়াল, হয়তো সেই অর্থেই কবিতা হয়ে ওঠে স্পিরিচুয়াল, সেকুলার হয়েও। কিন্তু প্রতিদিনের হন্যে-হওয়া মানুষের তো সময় বা আগ্রহ হবার কথা নয় সেই আত্মিকতাকে চাইবার বা বুঝবার, বাইরে না রেখে মনটাকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেবার! এরই ফলে, সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক।

মনে পড়ে আঁদ্রে জিদের উপন্যাসের এক টুকরো, যেখানে নায়ক জেরোম একদিন বাগানের মধ্যে ঘুরছিল তার প্রণয়িনীর বোনের সঙ্গে। সেই বোন, জুলিয়েত, জানত যে জেরোমের মনে সব সময়ে জড়িয়ে আছে কবিতার টান, তারও তাই শোনাতে ইচ্ছে হলো বোদলেয়রের কবিতার কয়েকটি লাইন। শুনে চমকে যায় জেরোম। কবিতার কথা বলছ? তুমি? অভিমান করে বলেছিল জুলিয়েত, তুমি ভাবো আমার এতই বুদ্ধি কম যে কবিতাও পড়ি না আমি।

জেরোম তখন বুঝিয়ে বলেছিল তাকে, অনেক স্নেহে, এ কোনো বুদ্ধি-অবুদ্ধির কথা নয়, এ কেবল প্রবণতার কথা। প্রশ্নটা ধরনের, চরিত্রের। কেউ বা পড়ে, কেউ পড়ে না।

জীবনটা চলছে, আমিও চলছি তার মধ্যে। কিন্তু কী এই চলার সম্পর্ক আর বিন্যাস, তার দিকে ফিরে তাকাবার গরজ হবে সবার, ইচ্ছে হবে ভিতরের জোড়-গুলিকে দেখবার আর খুলবার, এটা আশাও করা যায় না। আর যার নিজের কাছে প্রশ্ন নেই, প্রাত্যহিক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এই আত্মিকতায় পৌঁছবার কোনো গরজ নেই যার, সে কেনই-বা কবিতা পড়বে? কবিতার উচ্চারণ মাত্রেই তার কাছে তৈরি হবে এক দূরত্ব, এক দুর্বোধ্যতা, যদি-না সে ভর করতে পারে কবিতার ভুল কোনো জায়গায়, তার গল্পের খোঁজে অথবা তার মিষ্টি কথার খোঁজে। মুশকিল যে, সেই খোঁজটাই বেশি।

আত্মিকতা নয়, কেউ কেউ বলেন আধ্যাত্মিকতা। কথা হলো এক অরবিন্দভক্তের সঙ্গে। আকাশে যখন ঝড়বিদ্যুৎ, আর প্রতিবেশী বৌদ্ধরা যখন গম্ভীর ঘণ্টা বাজিয়ে স্তব করছে অবিচিত্র উদাত্ততায়, আমাদের তখন কথা চলছিল শিল্পমীমাংসার।

আমাদের বুদ্ধিতে-পাওয়া চোখে-দেখা রিয়্যালিটি যে শেষ কথা নয়, আরো এক স্পন্দনময় অতিরেকের জগৎ যে আছে, আছে ভালোবাসায় পাবার মতো অন্তর্মূল, সে তো ঠিক। কিন্তু ভক্ত যখন সেটাকে নিতে চান ঈশ্বরবিশ্বাসের কাছে, সেইখানে আর মেলানো যায় না নিজেকে। একটা কস্‌মিক ইন্‌টেন্‌শনে বিশ্বাস রাখেন এঁরা, সেইখান থেকে এঁরা ধরতে চান রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ অথবা ইকবালকে, কিংবা ওই একই রকমভাবে তেইয়ার দ্য শার্দ্যাঁকে। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি মনে করতে পারেন যে এই আত্মিক মুক্তি, এই ভালোবাসার প্রচার, এ আমাদের ব্যাবহারিক সমতাও তৈরি করে দিতে পারে একদিন? অন্তত বেঁচে থাকবার মতো কোনো সংগতি? অন্যসব

ভক্তের মতো ইনিও পিছিয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে, এড়িয়ে যান প্রশ্ন। বলেন, পারা যায়নি বটে, কিন্তু পারা যে যেত না তা নয়। 'তেমন করে চেষ্টা কেউ করল কই?' করেনি কেউ চেষ্টা? এত যুগ ধরে ধর্মসাধকেরা তবে করলেন কী?

আধ্যাত্মিকতার এই আবেগ থেকে এঁরা ভাবতে পারেন অরবিন্দর 'সাবিত্রী' হলো আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। বোদলেয়র বা এলিয়ট বা জীবনানন্দের নাম মাত্রেই এঁদের বিরক্ত করে তোলে, কবি হিসেবে এতই না কি অসার এঁরা। এসব কথা নিয়ে অবশ্য তর্ক তোলাও নিষ্ফল, কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস এই যে এঁরা যাঁর ভক্ত, সেই অরবিন্দর মন ছিল কতই স্পষ্ট আর গ্রহিষ্ণু। আমাদের দেশের মনীষীদের মধ্যে অরবিন্দের মতো এত স্বচ্ছ উদার সাহিত্যচিন্তা খুব কমই পাওয়া যায়। মনে না হয়ে পারে না রবীন্দ্রনাথের তুলনা। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই তাঁর কবিতায় কুড়িয়ে নেন আধুনিকবাদের কোনো কোনো ছিন্ন প্রত্যঙ্গ, কিন্তু সচেতন মনে কেবলই লড়াই করেন এর সঙ্গে। আর অরবিন্দ তাঁর কবিতায়

(নিজেকে যদিও তেমন-কোনো কবি বলে ভাবতেন না তিনি) আধুনিকতাকে ছোঁননি একেবারে, কিন্তু ইওরোপীয় আধুনিক কবিতার মর্ম অনেকখানি ছুঁয়ে ছিলেন তাঁর ভাবনায় বা বিশ্লেষণে। মালার্মে বা বোদলেয়রকে কত শ্রদ্ধা আর সহমর্মিতায় বুঝতে চান তিনি! আজ মনে হয় যে এঁরই প্রভাবে নলিনীকান্ত গুপ্ত এত বেশি আধুনিক ইওরোপীয় সাহিত্য বিষয়ে লিখতে পারেন, ভাবতে পারেন, কিংবা দিলীপকুমার রায় 'পথের পাঁচালি'র সমালোচনাতেও উপশিরোনাম হিসেবে জুড়ে দিতে পারেন বোদলেয়রের কবিতা থেকে এক স্তবক!

এঁরা কেন এত তবে বিমুখ?

বৃষ্টি

আজ বিকেলের বৃষ্টিতে যখন ঘরে বন্দী, সঙ্গে ছিলেন দর্শনের দুই বন্ধু। কথা বলবার সময় নয় সেটা, তবু হঠাৎ, খানিকটা সময় কাটাবার ছলেই, কথা তুলে-

ছিলাম : 'এটা কেন হয় যে বৃষ্টিতেই স্মৃতির টান পড়ে বেশি?' হতে পারে যে প্রশ্নটাই ছিল ভুল, কিংবা কোনো উত্তর না দিলেও চলত এ-কথার, তবু দর্শনের দিক থেকে হয়তো এঁরা ছুঁতেই চাইলেন বিষয়টাকে। মোহান্তি অবশ্য মৃদু গলায় বলেছিলেন একবার, এটা তো ওঁদের বলবার কথা নয়, এ হলো সাহিত্যেরই ভাববার কথা। হতে পারে তা, তত-কিছু শক্তও নয় হয়তো উত্তরটা, তবু বলতে শুরু করলেন ওঁরাই।

মোহান্তি বলতে চান, অন্য-সব সময়ে বাইরেটাকে আমরা দেখিই না ঠিকমতো, বৃষ্টিতে আমরা বাধ্যত দেখছি প্রকৃতিকে—এই যেমন এখন—আর তাই, বিশেষ কোনো ঘটনা বা অনুভবের স্মৃতি নয়, একটা-কোনো সাধারণ ধাঁচের স্মৃতিরস এসে যায় মনে। ইনি হয়তো বলছেন সেই কালিদাসেরই জননান্তর-সৌহৃদানির কথা।

মানসীদির কথা হলো, বৃষ্টির শব্দটাই আসল। সেই শব্দ আমাদের পুরোনো এমন-অনেক অভিজ্ঞতাকে টেনে নিয়ে আসে যেখানে অনুরূপ কোনো শব্দ হয়তো ছিল। আর, শব্দ নেই বলেই, তুষারপাতের

সময়ে এ-রকম অনুভূতি হয় না, বিদেশে উনি লক্ষ করেছেন।

তাই কি? তুষারপাতে আমাদের যা অভিজ্ঞতা হবে, ওদেশের মানুষেরও কি তেমন? উনি অবশ্য বলতে চান তা-ই, সেইজন্যেই না কি সমারসেট মমকে গল্প লিখতে হয় 'বৃষ্টি', তুষার তো নয়। এ বোধ হয় অতিসরলীকরণের দৃষ্টান্ত। ফেলিনির 'আমারকর্ড' ছবিতে যে নিবিড় তুষার-আবহ ছিল, গোটা একটা শহরের সত্তা যেভাবে মথিত এক মদিরতায় ডুবে যাচ্ছিল সেখানে, তাতে তো মনেই হয় যে তুষারপাত ওখানে টান দিতে পারে সকলেরই মূল পর্যন্ত! আর, ছবির কথাই বা কেন। বিদেশের গল্পে বা কবিতায় প্রায়ই কি জড়িয়ে আসে না এই আবহ? ব্রিজেসের 'লণ্ডন স্নো' কবিতায় সকলের মন কি বেরিয়ে আসছিল না প্রতিদিনকার গণ্ডি থেকে? কোনো কথা নেই যেখানে, যেখানে 'দি ডেইলি থট্‌স্ অব্ লেবার অ্যাণ্ড সরো স্লাম্বার'? এই-ই তো ধরন, যখন বৃষ্টির অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলবেন, 'মিছে এ জীবনের কলরব'। পুশকিনের শীতসন্ধ্যার এক কবিতায় যেমন আছে

মুখোমুখি একান্তে কোনো গান শুনতে চাওয়ার কথা। অথবা তেমনি এক শীতের সন্ধ্যা নিয়ে পাস্তেরনাকেরও কবিতা আছে যেমন, যে-কবিতায় শার্সি-বন্ধ ঘরের চারদিকে ঝরছে তুষার আর ভিতরে মোমবাতির অল্প আলোয় নরম ছায়া আর মন-খারাপ-করা কবি। গেয়র্গে ট্রাক্‌ল্‌-এর ছোট্ট এক কবিতায় তুষারের মধ্য দিয়ে ভ্রাম্যমাণ পথিক যেন ফিরে আসে ঘরে। ঠিক একই ধরনের নয়, ভিন্ন একটি ছবি ছিল কোন্‌-এক স্পেনীয় কবিতায়, কবরের শাদা ফলকের ওপর জমছে শাদা হিম, যেন নীরবতার ওপর নামছে এসে অন্য এক নীরবতা।

কথাটা ছিল আমাদের বৃষ্টি নিয়ে, মনের ওপর তার প্রতিপত্তি নিয়ে। কী ঘটে ঠিক? মনে তো হয় বৃষ্টিতে একই সঙ্গে ঘা পড়ে অনেকগুলি অভিজ্ঞতায়। দৃশ্য শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন্দ্রিত হয়ে ওঠে একসঙ্গে। এতটা মিশে যাওয়া কি প্রাকৃতিক আর কোনো অনুষঙ্গে ঘটে? এরই জন্য নিশ্চয়, মানুষ হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে ফিরে আসে নিজের কাছে, নিজের মধ্যে। সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন এইভাবে বন্দী করে নিজেকে ফিরিয়ে

দেয় ভিতর দিকে, সেই ফিরে আসার প্রবলতায় মনের জড়তা যায় খুলে, গহ্বর থেকে উঠে আসতে থাকে পুরোনো-সব আমি। দেশকালেরই একটা বদল হয়ে যায় তখন। যে-দেশ বা যে-স্পেস আমার সামনে ছড়ানো, সেইটের সঙ্গে মিলে যায় এক সময়প্রবাহ। বর্তমান শুধুমাত্র বর্তমান থাকে না বলেই পরিচিত স্পেসটাও আর পরিচিত গণ্ডির মধ্যে বাঁধা থাকে না তখন। এই হচ্ছে সুন্দরের তত্ত্ব, এই হচ্ছে স্মৃতির রহস্য।

কিন্তু এসব বোধ হয় বলেছি কদিন আগে, 'ডাক-ঘর' বিষয়ের সেই লেখাটিতে। কাজেই আপাতত স্মৃতির স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়াই ভালো। আজ কি আষাঢ়স্য প্রশমদিবস? না কি পয়লা শ্রাবণ?

তুমি কোন্ দলে

'তুমি আর নেই সে তুমি' কবিতাটি লিখে ভালো করিনি, কলকাতায় একজন বন্ধু না কি এ-রকম বলেছেন। পয়েন্ট কী এটা লেখার, এই না কি তাঁর

প্রশ্ন। কথাটা একটু ভাবিয়ে তুলল। কেউ যদি বলেন, লেখাটা ভালো লাগেনি, সহজেই বোঝা যায় সেটা। কিংবা যদি কেউ বলেন যে, এ-লেখার মধ্যে যে মতির প্রকাশ আছে তার একেবারে বিরোধী তিনি, তবে তারও একটা যুক্তি বোঝা যায়। কিন্তু একজন যে-কথা লিখতেই চাইছেন, সে-কথাটা না লিখলেই সংগত হতো, এ-ভাবেও কি তর্ক তোলা যায়? পাঠক হিসেবে, ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘগত পাঠক হিসেবে, আমি কি এই দাবি তুলতে পারি যে আমার ভাবনাপদ্ধতির বা রুচিপদ্ধতির বাইরে কথা বলতে পারবেন না একজন লেখক?

লেখা যখন প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে ছুঁয়ে থাকে, তখনই এ-প্রশ্নটা আরো জটিল হয়ে দেখা দেয়। আরো জটিল, কেননা প্রতি নিশ্বাসে তখন পরখ করা হয়: তুমি কোন্ দলে। খুব ছেলেবেলায়, সম্ভবত 'শিশু-সাথী'র পাতায় (না কি অন্য কোথাও?) ফিরে ফিরে কেবলই একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখতাম, 'তুমি কোন্ দলে'। নামটা টানত খুব, কিন্তু বইটা পড়া হয়নি আজও। পড়া হয়নি, তবু সেই নাম বিঁধে আছে

মাথার মধ্যে, কেননা এখন চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে সবাই সবাইকে অনুচ্চারিত একটা জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে দেখছে, দেখতে চাইছে : তুমি কোন্ দলে ?

এক হিসেবে, তর্ক তুলতে পারেন কেউ, তাই তো হওয়া উচিত। রাজনীতি বা লোকনীতি, বা সাহিত্য-নীতি, যেদিক থেকেই হোক-না কেন, আমাদের ভাবনার তো একটা চেহারা আছে, অন্তত থাকবার কথা। সেই ভাবনা, তার বিরোধী ভাবনা, ভিন্ন কোনো ভাবনা, এমনি করেই তো টুকরো টুকরো অনেকগুলো ভূমি তৈরি হয়। এটা তো জেনে নেওয়াই চাই যে তার কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো তুমি। লেখার মধ্য দিয়ে বা কাজের মধ্য দিয়ে এই অবস্থানটিকে দেখতে চাওয়ারই তো অন্য নাম হলো উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত ওই প্রশ্ন : তুমি কোন্ দলে। সেটা কি সংগতই নয় ?

ঠিক। কিন্তু মুশকিল এই যে, দৃষ্টিভঙ্গিগত এই দলের ভাবনাকে ক্রমেই আমরা খুব ছোটো করে আনছি, খুব সংকীর্ণ। সেই সংকীর্ণতায় দল কথাটার কোনো দর্শনগত ভিত্তি আর বড়ো হয়ে থাকে না,

বড়ো হয়ে ওঠে নিছক একটা পার্টিগত ভিত্তি। যুক্তি-ক্রমটা ঘুরে যায় তখন। এটা যথার্থ বলেই আমার পার্টি এটা করে, এই ধারণাটা উলটে গিয়ে দাঁড়ায় : আমার পার্টি এটা করে বলেই এটা যথার্থ। দল যখন আমার কাছে দলীয়তা চায়, তখন এই বিচার-বিসর্জন চায়, বুদ্ধিসমর্পণ চায়।

তখনই, যে-কোনো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে সবাই দেখতে চান, এই লেখায় বা এই কাজে তুমি কাকে সমর্থন করছ, কার বিরোধিতা করছ? কিন্তু সমর্থন তো কোনো ব্যক্তিকে অথবা গোষ্ঠীকে নয়, সমর্থনের কথা ছিল তো কোনো কাজকে, কোনো পদ্ধতিকে। একজন মানুষ, যাকে আমি নির্ভরযোগ্য এবং ভালো মানুষ বলেই ভাবি, তিনি কি কখনো এমন কাজ করতে পারেন না যা আমার বিবেকসমর্থন পায় না? যদি তিনি তা করেন কখনো, তবে সে-কথা বলা কি আমার পক্ষে অসংগত হবে? সে-কথা বললে কি সেই মানুষটির বিরুদ্ধে কথা বলা হবে, না কি তাঁর একটি ভাবনার বিরুদ্ধে মাত্র, তাঁর বিশেষ একটি কাজের বিরুদ্ধে? এইখানেই একটা জট তৈরি হয়,

আর কাজের সঙ্গে ব্যক্তিকে আমরা একাকার করে নিই। বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তির বিষয়ে যেমন এটা সত্য, কোনো একটি দল বিষয়েও তাই।

প্রতিটি কথাকে, প্রতিটি কাজকে, তার নিজের মূল্যে বিচার করা ছাড়া আমাদের আর উপায় কী। তা যদি না করি তাহলেই অগোচরে আমরা প্রতিষ্ঠানগত হয়ে পড়ি, তাহলেই দেখা দিতে থাকে একধরনের ধর্মীয় অন্ধতা। আমাদের দেশ জুড়ে এইটেই একটা ভয়ের দিক এখন। যাঁকে আমরা মানি অথবা ভালোবাসি তাঁর বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না, তাঁর সবটাকেই আমার নিতে হবে নির্বিকার এবং নির্বিচার আনুগত্যে, আর অন্যদিকে, যাঁর বিষয়ে আমাদের সামান্য কোনো প্রশ্ন উঠবে তাঁকে ভাবতে হবে সর্বতোভাবে পরিহার্য বা ঘৃণ্য, এই জায়গায় এসে যদি দাঁড়ায় মানুষ তবে তার মতো সর্বনাশ আর নেই।

এর থেকে অন্য একটা কর্মনৈতিক বিতর্কও ওঠে। ধরা যাক আমার দলের কোনো-একটি ভাবনা আমার বা আমাদের কারো কারো পছন্দ হলো না। সেই অপছন্দকে যদি প্রতিবাদের ভাষা দিই, তাহলে কি সেটা বিরোধী পক্ষের পরোক্ষ সহায়তা নয়? সে-পক্ষ বড়ো একটা যুক্তি হিসেবেই কি প্রয়োগ করবে না সেটা, তৈরি হবে না কি এক বিপন্নতা? কোনো কোনো সময়ে নীরবতাই কি তাহলে সৎযুক্তি নয়? উপায় হিসেবে, স্ট্র্যাটেজি হিসেবে, কোনো কোনো উচ্চারণকে স্থগিত রাখাই কি কর্তব্য নয়?

এ-যুক্তি কতটা নির্ভরযোগ্য?

সত্য কাকে বলে, তার বিচার নিয়ে একটা গল্প শুনেছি আমরা অনেকদিন। সেই সাধুর গল্প, যিনি মিথ্যে বলবার দায় এড়াতে গিয়ে সাহায্য করেছিলেন একটি খুনের। তাঁর তপস্যার কুটিরের সামনে দৌড়ে এল ত্রস্ত তাড়িত এক পথিক, আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য লুকোল সে সাধুর কুটিরে, পশ্চাদ্ধাবক দুর্বৃত্ত জানতে চাইল সাধুর কাছে কুটিরে কেউ এসেছে

কি না। কী বলবেন তখন সাধু? সত্য বললে নিরপরাধ একজন মানুষের প্রাণনাশ, আর তার প্রাণ বাঁচাতে গেলে মিথ্যে বলতে হয়। সত্যই বললেন তিনি। কিন্তু এতে কি তাঁর সংগত সত্যরক্ষা হলো?

ঠিক, এ-রকম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সত্যের কোনো পরম মূর্তি ভাবতে পারি না আমরা, ভাবতেই হয় তার আপেক্ষিকতা। এ-রকম সর্বনাশের সামনে সত্য তার রূপ পালটায়। হয়তো এই তর্কই তুলতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম তাঁর কৃষ্ণচরিত্রের বিবেচনায়, তরুণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন বিরোধ হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু সর্বনাশের এই যুক্তিটাকে আমরা কতদূর প্রসৃত করে নেব? এ যুক্তিতে আমরা আমাদের অভিপ্রেত সমস্ত মিথ্যাকেই, সমস্ত ভ্রান্তিকেই সত্যের মুখোশ দিতে চাইব না তো? বড়ো একটা লক্ষ্যের জন্য যে-কোনো উপায়ই ভালো, এই ভাবতে ভাবতে, উপায়ের হীনতায় আমরা একটা সমগ্র জাতিকেই সুবিধাবাদের আশ্রয়ে হীন করে তুলতে চাইব না তো? হীন এবং অনাচারী এবং নির্বীর্য? জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর যে কোনো রাজনৈতিক প্রতিবাদ সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি, ভীরুতাই

নিশ্চয় তার একমাত্র কারণ নয়, নিশ্চয় তার পিছনে কাজ করছিল ঠাণ্ডা মাথার বিবেচনা। স্ট্র্যাটেজি হিসেবে কারো কারো নিশ্চয় সংগত মনে হয়েছিল সেই নীরবতা, আর তখনই রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিল ঐতিহাসিক সেই চিঠি। এটা একটা বড়ো মুহূর্ত। এর তুলনায় অনেক ছোটো ছোটো মুহূর্ত আমাদের কাছে কেবলই এসে দাঁড়ায়, কেবলই আমাদের কাছে দাবি করে কোনো সিদ্ধান্তের, কোনো প্রতিবাদের, কোনো কর্মনীতির। তখন কি আমরা উপায়টাকেই একান্ত করে ভাবব কেবল, তার বহুদূরের লক্ষ্যটাকে নয়?

এই উপায়-নির্ভরতা অল্পে অল্পে আমাদের ছলনাপটু করে তোলে, তাও আবার আত্মছলনা। এই ভূমিকায় দেখলে 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের কোনো কোনো সংলাপ আজ যেন প্রতিমুহূর্তে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে; 'ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা? হেন আজ্ঞা মাতৃআজ্ঞা বলে করিলে প্রচার?' রঘুপতি জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আর কী উপায় আছে বলো!' আর তখনই, উপায় শব্দটিকে নিয়ে আমূল আর্তনাদে

অস্থিরতা জানিয়েছিল জয়সিংহ। চোরের মতো রসাতল-গামী হয়ে, সুড়ঙ্গপথ খুঁড়ে তবেই চলতে হবে আমাদের, এই ভাবনাকে সমস্ত সত্তা দিয়ে ধিক্কার জানাচ্ছিল সে। আমাকে আকর্ষণ করে এই ধিক্কার। মনে পড়ে 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' কাব্যনাট্যে বেকেটের কথাগুলি : 'We are not here to triumph by fighting, by strategem !'

কিন্তু তার মানে কি সবটাই মেনে নেওয়া, লড়াই-টাকে বন্ধ করে দেওয়া? 'We have only to conquer now by suffering !' এই তত্ত্ব, অথবা রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের তত্ত্ব, সে কি আমাদের একটা প্রতিক্রিয়াশীল নিশ্চলতার মধ্যেই নিয়ে যাবে না? আক্ষরিকভাবে একে গণ্য করলে সেটাই অবশ্য ভবিতব্য। কিন্তু অন্য আরেকদিক থেকে যদি দেখি তাহলে এই দুঃখের আত্মীকরণ ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না আমাদের। কেননা এ দুঃখ তো কেবল দার্শনিক কোনো দুঃখের ধারণা মাত্র নয়, এ হলো কাজ করবার, কাজের অনেক আপাতব্যর্থতার মধ্য দিয়েও মূল সফলতার দিকে স্তরে স্তরে এগোবার,

অনেক আঘাতের অনেক ধৈর্যের অনেক পরীক্ষার দুঃখ। এ দুঃখ এড়িয়ে নিছক সহজ পথে জীবনের বা সমাজের মুক্তি কে কবে পায়?

আন্দোলনে আন্দোলনে সেই দুঃখকেই আমরা বরণযোগ্য করে তুলি, ঠিক। প্রতিদিনের শ্রেণীগত অত্যাচারে সেই দুঃখকেই আমরা বহন করে চলছি, তার থেকেই মুক্তি চাই, ঠিক। কিন্তু সেইজন্যেই, সেই মুক্তির জন্যেই, সম্ভাব্য সেই মুক্তির পরবর্তী কোনো সুস্থ দিনের জন্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার দরকার আছে, আর এই প্রস্তুতিই হলো একটা বড়ো দুঃখ। আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে দীর্ঘকাল জুড়ে আমরা কেবল না-এর দিকটাকে বড়ো করে তুলেছি, ইতির দিকে ভর আমাদের কম। করার দায়িত্ব নিতে নিজেদের আমরা তত প্রস্তুত করিনি, না-করার সুযোগ নিতে যত। আমরা দাবি করেছি, কিন্তু দায় নিইনি। আমরা সমালোচনা করেছি, কিন্তু সৃষ্টি করিনি। আমরা খণ্ড খণ্ড উপায় ভেবেছি, কিন্তু তা যে আমাদের লক্ষ্যের সমগ্রতাকেও অনেক সময়ে খণ্ড খণ্ড করে দেয়, সেই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা আমরা মনে রাখিনি।

বিরলতা পাওয়া গেছে বলে (তাছাড়া, হয়তো এই খাতাখানা উপহার পাওয়া গেছে বলেও) যেমন এই ডায়েরি, তেমনি কদিন সময় কাটাবার ফন্দি হিসেবে স্বপ্নবৃত্তান্তও লিখতে শুরু করেছিলাম। একদিনও কি ঘুমিয়েছি স্বপ্নহীন? কিন্তু আর ভালো লাগল না আজ। না লাগবার একটা কারণ বোধ হয় এই যে আমার স্বপ্ন বড়োই প্রাত্যহিক, যেন দিনগুলিরই আরেকটা স্রোত, একটু বাঁকা স্রোত যদিও। তাছাড়া, লিখতে গেলেই স্বপ্নের fluid ধরন, যেটা তার সব-চেয়ে বড়ো টান, নষ্ট হয়ে যায়। পড়ে থাকে কেবল শুকনো কঙ্কাল, তখন তাকে অর্থহীন লাগে আরো।

একটা ছবি কি পারম্পর্য নিয়েও অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারে স্বপ্ন? যাকে বলছি fluid, সে তো বড়ো-একটা টের পাই না কাফ্‌কার স্বপ্নবিবরণ থেকে। আর কারো ডায়েরিতেই বোধ হয় স্বপ্নের এতটা ইতিহাস নেই, কাফ্‌কায় যেমন। আর সেটা প্রত্যাশিতও বটে, কেননা স্বপ্নরীতিকেই তিনি করে তুলেছিলেন তাঁর রচনার একটা বড়ো ধরন। ডায়েরিতে

দেখি, কাফ্‌কার স্বপ্ন অনেকসময়ে কোনো থিয়েটার হলের, অথবা জটিল কোনো পথচলার, কোনো আততায়ীর কিংবা কোনো আর্ত ত্রাণেচ্ছার। সেটা কথা নয়। কথা হচ্ছে, থিয়েটারের অভিজ্ঞতা (বা পথেরও) অনেকক্ষণ ধরে থিয়েটারেরই (বা পথেরই) লজিক নিয়ে চলতে থাকে, এতটা সংগতি আসে কেমন করে তাঁর স্বপ্নে? লিখবার সময়ে কি গেঁথেও তোলেন খানিকটা? মুছে নেন ভিতরের ঝাঁপ-গুলোকে? আর যদি তা করেন তো স্বপ্নের একটা বড়ো আকর্ষণ—আকর্ষণই নয় কেবল, বড়ো-একটা সত্যও—সরে যায় না কি? রবীন্দ্রনাথ যে দশ-পনেরটি স্বপ্নের কথা বলেন তাঁর জীবন জুড়ে, সেগুলি যে প্রায়ই খুব ছোটো, তার একটা বরং মানে বোঝা যায়। বোঝা যায় যে একটিমাত্র লহমাকে তিনি ছুঁয়ে রাখছেন তাঁর বর্ণনায়, ছেড়ে দিচ্ছেন নিশ্চয় বাকি অনেকটা।

কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে স্বপ্ন? ইয়েট্‌স একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন তাঁর আত্ম-জীবনীতে। আধো তন্দ্রায় যেন তিনি দেখছিলেন, লাফিয়ে চলেছে এক পক্ষীরাজ ঘোড়া, আর সুন্দরী

এক নগ্না নারী তীর ছুঁড়ছে নক্ষত্রের দিকে। এই দেখাটাই যে আশ্চর্য তা নয়, আশ্চর্য এই যে পরদিন সকালেই আর্থার সাইমন্‌স্‌ এক কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন তাঁকে, স্বপ্নে-পাওয়া কবিতা, যে-স্বপ্নে সাইমন্‌স্‌ অসামান্যা এক রূপসীকে দেখেছিলেন। লণ্ডনে গিয়ে তিনি এক গল্প পড়তে পান যাতে ছিল আকাশের দিকে শরনিক্ষেপকারিণী কোনো নারীর বর্ণনা। ইয়েট্‌সও কদিন পরে লণ্ডনে এক শিশুর মুখে শুনতে পান, 'মা, একজন মেয়ে আকাশে তীর ছুঁড়ছে, ভগবানকে বোধ হয় মেরে ফেলছে সে!' কিছুদিনের মধ্যে শোনা যায় আরেক শিশুর বর্ণনা, বন্দুক দিয়ে তারার দিকে গুলি করছে একজন, আর খসে পড়ছে তারা। অবশ্য এতে তার দুঃখ হয়নি খুব, কেননা তারাটা ছিল বুড়ো!

এত কাকতালীয় কী করে সম্ভব? ইয়েট্‌স অবশ্য তখন ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি-দের ভাবনায় জড়িয়ে ছিলেন, এক মন থেকে আরেক মনে সঞ্চারের তত্ত্বটা মেনে নেওয়া হয়তো তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল না। কিন্তু সেই তত্ত্বে বিশ্বাস না থাকলে এ কি কেউ মানতে চাইবে?

বানানো মনে হয় না? কিন্তু এত সহজে কাউকে মিথ্যাভাষী বা অভিসন্ধিময় ভেবে নেওয়াটাও শক্ত।

কেবল এইটেই নয়, আরো একবার ইয়েট্‌স লিখেছেন তাঁর বোনদের বিষয়ে। একই রাত্রে ললি দেখেছিলেন স্বপ্নে তিনটি মৃতদেহ, অন্য এক মহিলা তিনটি শবযাত্রা, আর লিলি যেন স্বপ্নে পেয়েছিলেন তিনটি টেলিগ্রাম। বাইরে কী ঘটেছিল? সে-বিষয়ে ইয়েট্‌স কিছু জানেন না, তিনি কেবল দুর্ভাবিত ছিলেন এই তিনের সম্ভাব্য কোনো যোগ নিয়ে।

আমার বন্ধুদেরও অনেককে দেখেছি এই রহস্য নিয়ে আকুল। প্যারাসাইকোলজির চর্চা এসব, গভীরভাবেই মানেন অনেকে। আমার কেন কিছুই এর গ্রহণযোগ্য লাগে না? সে কি এইজন্যে যে এঁদের তুলনায় আমি অনেক ইন্‌সেন্‌সিটিভ? কল্পনাহীন? আশা তো করা যাক যে কল্পনা করবার অন্য কিছু কিছু ভালো জিনিসও আছে। এবং স্বপ্ন দেখবার।

অনেকদিন ধরে লেখা হয় না যখন, মন তখন চারদিক থেকে খুঁজে বেড়াতে চায় অল্পলেখার সমর্থনে যত যুক্তি। এ কেবল নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মতো একটা ছল। তখন মনে পড়ে সেই ইংরেজ তরুণটির কথা, যে বেশ তৃপ্তি নিয়ে বলেছিল : এ বছরটায় আমি বেশ ভালো কাজ করেছি। কী করেছ? তার উত্তরে শুনেছিলাম যে পনেরোটি কবিতা লিখতে পেরেছে সে বছর জুড়ে, কাজেই সে খুশি। কিংবা মনে পড়ে গায়ত্রীর স্বামী স্পিভকের কথা, যে বলেছিল বছর তিনেকের জন্য সে এখন একলা আছে দূরে, কেননা একটি উপন্যাস লিখছে সে, হয়তো কয়েক বছরে শেষ করতে পারবে।

এই নিশ্চয়তায় বা এই প্রসাদে আমরাও ভর করতে পারি না কেন? আমরা যদি তেমন কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে চাই যেখানে প্রতিটি উচ্চারণই পায় ভাস্কর্যের ক্ষমতা, যেখানে প্রতিটি শব্দই উঠে আসে তার সমস্ত শক্তি আর সত্য নিয়ে, তাহলে মুহুর্মুহু লিখতেই-বা হবে কেন? পারবেনই-বা কীভাবে একজন? নিজের সম্ভাবনাকে আমাদের লেখকেরা কি কেবলই

তরলিত করে ছড়িয়ে দিচ্ছেন না সময়ের প্রবাহের মধ্যে, কেবল চলতি সময়টাকে ছুঁয়ে থাকবার জন্য ? বর্তমানের বা সাম্প্রতিকের আতঙ্ক কি তাঁদের ভবিষ্যৎ থেকে নিবৃত্ত করে আনছে না অনেকখানি ? লোকের চোখের আড়ালে চলে যাবার একটা ভয় থেকে, অনেক সময়ে বন্ধুবৃত্তের বা সামাজিক বৃত্তের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ চাপ থেকে, সংকোচ বা সৌজন্য থেকে অনেক সময়ে লেখকেরা অতিক্রম করে যান তাঁদের সীমা, এবং ভাঙতে থাকেন ছোটো ছোটো ভাস্কর্যের দাবিকে, অলস ব্যস্ততায় নিজেদের ছড়াতে থাকেন বহুচারী অকর্মণ্যতায়, আর তার পর একদিন, অনেকদিন পরে নিজেদেরই অতীতের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখেন, কোথাও তেমন সঞ্চয় নেই কিছু।

হঠাৎ এই বইটি পড়ে বেশ ভয় তৈরি হলো মনে। লেখায় বেশ যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। রচনাগুলিকে ধরে ধরে যেভাবে বিচার করেছেন ইনি, প্রয়োগ করেছেন যে মান, সেটাই বেশ সন্দেহজনক লাগে। কিন্তু এতে আমার

ভয়ের কারণ কী? পাঠক হিসেবে এই লেখাকে মনে মনে প্রত্যাখ্যান করলেই তো মিটে যায় সব। মেটে বটে, কিন্তু একটা সমস্যা তবু এড়ানো যায় না। সমস্যাটা এই : আমরাও এইরকমই লিখি না তো? এইরকম ভাবেই পাঠকের বিরক্তি আর অবিশ্বাস তৈরি করি না তো?

অনেক বয়স্ক মানুষের চালচলন আজকাল ভালো করে লক্ষ করি, তাঁদের আচরণের মধ্যে কোন্‌টা মনে হয় অসংগত বা আঘাতপ্রদ, ভাবতে চেষ্টা করি তা। সেটা যে ঠিক তাঁদের বিচার করবার জন্য তা নয়, সে হলো নিজেকে সতর্ক করবার জন্য। মনে হয় কোন্ কোন্ আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, তার এক সচল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন আমাদের সামনে নিত্যই ছড়ানো হচ্ছে। নিজেকে তো সব সময়ে—বা, প্রায় কখনোই—দেখতে পাই না আমরা। দেখবার একটা যোগ্য আয়না পাওয়া যায় অন্যদের মধ্যে, আর তাই অন্যদের এত করে লক্ষ করতে হয়।

লেখাও তেমনি। অন্যের লেখা পড়েই ঠিক-ঠিক বোঝা যায় নিজের লেখার অতলস্পর্শী শূন্যতাগুলি,

শিখরস্পর্শী অহমিকাগুলি, অন্তঃসারহীনতার অবাধ বিস্তার। নিজে যখন লিখি, লিখিত শব্দগুলির চার পাশে আরো অনেক অলিখিত অনুষঙ্গ পরিবেশ বাক্য ব্যঞ্জনা কতই-না থেকে যায়, নিজে তো সেই শব্দ-গুলিকে দেখছি তার সর্বস্ব নিয়েই, কিন্তু পাঠকের কাছে তা যখন পৌঁছয় আপেক্ষিক রিক্ততায় তখন অনেক কিছুই তো পায় না তারা। নিরাসক্ত পাঠক হিসেবে কি নিজের লেখাকে পড়তে পারি আমরা? বিচার করতে পারি তাকে দূর থেকে? পারি না সব সময়ে। তাই, যখন এরই তুল্য কোনো লেখা দেখি অন্য লেখকের হাতে, তার শূন্যতাগুলি থেকে অভাব-গুলি থেকে বুঝতে পারি আমারও কোথায় সর্বনাশ। বড়ো বড়ো লেখকের পদ্ধতি থেকে অনেক যেমন শিখবার আছে আমাদের, অনেক যেমন শিখতে পারি তাঁদের তির্যক এবং সংক্রামক বিন্যাস থেকে, তাঁদের বোধ থেকে, তেমনি উলটো করে অনেকটাই শেখার আছে লেখকের ব্যর্থতা থেকে, সে-লেখার স্খলন আর অসারতার প্রতিফলন থেকে। করার জন্য শেখা, না-করার জন্য শেখা—দুটোই তো শেখা।

ককৃতো বলেছিলেন একবার : সমালোচক ? তার কথা আর বোলো না। একবার এক নাটকে আমার আলোর ব্যবহার দেখে একজন খুঁত ধরেছিলেন খুব, শনিবারের সন্ধেয় ছিল শো। মন দিয়ে শুনেছিলাম আমি, তবে বদলাবার আর সময় ছিল না রবিবারের ম্যাটিনিতে। কিন্তু সেই ম্যাটিনি দেখে সমালোচক খুশি হয়ে জানালেন — দেখলে তো, আমার পরামর্শে কেমন সুফল হলো !

'নিন্দা পরব ভূষণ করে কাঁটার কণ্ঠহার / মাথায় করে তুলে লব অপমানের ভার' বলতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। জীবনানন্দ বলেছিলেন 'ছায়াপিণ্ড', প্রায় সেইভাবেই বলেছিলেন ইয়েট্‌স। বা, আরো আগে অক্ষয়কুমার বড়াল, সমালোচককে বলেছিলেন 'প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি !' অবস্থার শিখরে উঠে, অবস্থার গহ্বরে লুটিয়ে কবি যা বুঝেছেন, তর্কে তা কেমন করে বোঝাবেন ? এই ছিল তাঁর অভিমান। জীবন তো সমভূমি নয় !

এসব হলো আত্মরক্ষার এক-একটা পদ্ধতি। নিজের সঙ্গে নিজে বোঝাপড়া করে নেওয়া। কিন্তু সত্যি

সত্যি কতটা শক্তি নিন্দের! নিন্দে শুনলে মন যে কিছুমাত্র দমে যায় না, একথা বললে মিথ্যে বলা হবে। বরং, প্রথম অভিঘাতে সমস্ত শরীরই অবশ হয়ে আসতে চায়, প্রকাশ্য জগৎটা সাময়িকভাবে অর্থ-হীন হয়ে আসে। তবে মানুষকে তো একটা বর্ম পেতেই হবে? যুক্তির একটা বর্ম সাজানো চাই মনে মনে। সেটা হতে পারে এইরকম: কথাটা যদি ভিত্তি-হীন হয় তবে লোকে বললেই বা কী আসে যায়, এতে তো দুঃখ পাবার মানেই নেই কোনো; আর কথাটা যদি সত্যি হয় তবে তো লোকের বলাই উচিত, এতে তো দুঃখ পাবার অধিকারই নেই কারো। ফলে, কোনো দিক থেকেই, ভেঙে পড়বার সংগত কোনো সমর্থন নেই।

কখনো কখনো এই লজিকে কাজ হয় বটে, কিন্তু মুশকিল যে, যুক্তি দিয়ে তো মনকে বাঁধা যায় না সব সময়ে!

তবু, নিন্দে মনে হয় ভালো। প্রশস্তির চেয়ে পুরস্কারের চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর নেই!

শৈলেশ্বরকে আবারও লিখতে হলো এই কথা যে লিখতে পারছি না কিছু।

অনায়াস সাবলীল লিখে যাবার তৃপ্তি, লেখা চাইলেই প্রস্তুত লেখা দিতে পারবার তৃপ্তি, শরীরের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে কোনো প্রবাহকে বইতে পারবার তৃপ্তি : সেটা কত কম সময়ে মেলে। কত মুহুর্মুহু মনে হয় শুধু অবসানের কথা, নিষ্ফলতার কথা, অনুর্বরতার কথা। কিছু-না-করার ভয়াবহতায় আচ্ছন্ন আছি কতদিন !

এক হিসেবে, একটা অবসান যেন দেখতে পাচ্ছি সামনে। নতুন একটা সময় আসছে স্পষ্টই, আর আমরা এখনো এক দ্বিধাচ্ছিন্নতার মধ্যে টলমল করছি। আমাদের চেতনাকে সেই ভাবী সময়ের দিকে প্রসৃত করে দেবার ঠিক ঠিক ভাষা কি আমরা জানি? আমাদের বোধে আর যুক্তিতে যেমন সামঞ্জস্য ঘটতে চায় না কিছুতে, তেমনি মিলতে চায় না আমাদের সময় আর ভাষা।

লেখা পাঠাতে পারলে হয়তো এসব কথাই লিখতাম, কিন্তু হলো না লেখা। প্রতীক্ষায় থাকা

যাক এখন ওদেরই লেখার জন্য। ভেবে দেখতে গেলে, ওদের এই লেখার মধ্যে একটা বীরত্বের দিক আছে, একটা অঘোষিত জয় আছে। লোকের চোখের আড়ালে থেকে লিখতে পারলেই সবচেয়ে সত্যি লেখা পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস হয় আজও, নেপথ্যের চেয়ে বড়ো শক্তি শিল্পীর কাছে আর কিছুই নয়, কিন্তু তবু মনে হয় কত দুঃসহ আর দুঃসাধ্য এই পরীক্ষা! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, উপেক্ষা আর ঔদাসীন্যের পরিবেশের মধ্যে লিখে যেতে পারা, কেবল নিজের ওপর কেবলই নিজের ওপর ভর করে নিজের চারপাশকে আমূল খুঁড়ে তোলা, তুলে কোনো বীজ মিলল কি না-মিলল সে-বিচারেও কেবল নিজেকেই প্রশ্ন করে ফেরা—এর জন্য যে পৌরুষ চাই তা বড়ো সুলভ নয় কোনোদিনই। তবু তো এতদিনের ভার নিয়ে লিখছে আজও শৈলেশ্বরের মতো অথবা অন্যদিকে সুবিমল মিশ্রের মতো মানুষেরা।

আবার, অন্যদিকে, এ অবস্থাটা মেনে নেওয়া ছাড়া তো উপায়ও নেই কোনো। চলতি সমাজের অসাড়তার আর অসারতার বিরুদ্ধে, তার ভণ্ডতার বিরুদ্ধে,

তার সাজানো বাজানো শ্বাসরোধী পেষণের বিরুদ্ধে যদি কথা বলতে চান কেউ, তবে তো সে-কথা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের এই চলতি পাঠকসমাজেরই বিরুদ্ধে, কেননা তাঁর পাঠক তো এরই মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে দিনের পর দিন। পাঠকের জন্য কথা বলতে চাইলে অনেকসময়ে পাঠকের বিরুদ্ধেই কথা বলতে হয় তাঁকে, অথচ কেই-বা চায় আক্রান্ত হতে, নিন্দেমন্দ শুনতে, আর সেই অর্থে সত্যকে জানতে। 'জার্নি টু দি এণ্ড অব নাইট'-এর সেলিন বলেছিলেন এক ইণ্টারভিউতে 'কী বলতে পারি তোমায়? কীভাবে খুশি করব তোমার পাঠকদের? ভদ্রসভ্র হয়ে কথা বলতে হয় তাদের সঙ্গে। তারা চায় যে তাদের আমরা আঘাত করব না কোথাও, কেবল আমোদ দেব তাদের!'

আমোদ যদি না দিতে চান কেউ, তবে পাঠকের সাম্প্রতিক ঔদাসীন্যই তাঁর সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। আর, সমকালের পুরস্কার হয়তো ভাবী সময়ের উদাসীনতার ইঙ্গিত। এর ব্যতিক্রম যে কখনো ঘটে না তা নয়, কিন্তু সে বড়ো বিরল, সে 'অনেক শতাব্দীর মনীষার কাজ'।

'প্রচারগ্রস্ত, বড়ো বেশি প্রচারগ্রস্ত আমরা'—সপরিতাপে বলেছিলেন সেলিন।

সে তা র

শেষ হলো সেতার, অনেকদিন পর নিখিল ব্যানার্জিকে শুনবার এই অভিজ্ঞতা। বাজনার ভিতরকার রূপরহস্য তো বুঝি না কিছু, জানি না সূক্ষ্ম আঙ্গিকের কোনো হিসেব। সেজন্যে অনেকখানিই পায় না নিশ্চয় আমাদের মতো শ্রোতা? কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, দরকারই-বা কী পাওয়ার? সুরটা যে শুনতে পাচ্ছি, তার মীড়ের মোচড়ে শিল্পীর এক আর্ত আনন্দিত মনটাকে যে ছুঁতে পারছি, এই কি অনেক নয়? আর্ত অথবা আনন্দিত নয়, আর্ত এবং আনন্দিত—বা বলা যাক নন্দিত। ঠিক একই সঙ্গে এই দুই বিপরীত মিলে থাকে এইসব সুর-সঞ্চারের কোনো কোনো মুহূর্তে, আর তখন মনে হয় যে সুরের চেয়ে বড়ো শিল্প বুঝি আর কিছু নেই। প্রায় শারীরিক ভাবে আমাদের ছুঁয়ে নিয়ে শরীরকে উত্তীর্ণ

করে নেয়, নিতে পারে এই সুর। এটা ঠিক যে ভাষা-শিল্পে চ্যালেঞ্জটা আরো বড়ো, কথা দিয়ে মানে দিয়ে কথার ওপারে যাওয়া বড়ো শক্ত, কবিতা তো সে-কাজও করতে চায়। এই বাধাটুকু তো পেরোতে হয় না সুরশিল্পীকে। ঠিক, কিন্তু চ্যালেঞ্জটা বড়ো হওয়াই যথেষ্ট কথা নয়, সে পৌঁছচ্ছে কতদূর তার হিসেবটাও বড়ো। এই-যে দুঘণ্টার অভিজ্ঞতা, যা আমাদের শরীরকে দ্রব করে দিচ্ছে, নিজেকে আর শুকনো কাঠ বলে মনে হচ্ছে না, মনে হয় যেন সজীব উদ্ভিদ, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও—কবিতা পড়ে কি এতটা হতে পারে? লেখার আগে বা পরের মুহূর্তে কবি নিজে হয়তো সে-অভিজ্ঞতা পান অনেকখানি, কিন্তু সে কি তিনি পৌঁছে দিতে পারেন তাঁর পাঠককে?

অবশ্য তাই-বা কেন! কোনো একটি কবিতা পড়বার বা কোনো একটি রচনা শুনবার অভিঘাতে অস্থির উন্মাদনায় ছুটে যেতে দেখেছি তো কোনো পাঠককে, দেখিনি কি? তার শরীরই তখন হয়ে ওঠে সেতার, সেও তো আছে আমাদেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে!

প্র তী ক্ষা

'দি লাস্ট সাপার'-এর ফ্রেস্কোটি আঁকবার জন্য দা-ভিঞ্চি নাকি দিনের পর দিন শূন্য দেয়ালের সামনে কেবল বসেই থাকতেন চুপ করে। কাজ শুরু করবার জন্য কেবলই এসে তাড়া দিতেন অ্যাবট। গল্পটার হালকা দিক এই যে শেষ পর্যন্ত ছবিটি তৈরি হলো যখন, দেখা গেল জুডাসের মুখের আদল যেন অনেকটা ওই অ্যাবটের মতোই! কিন্তু গল্পটার বড়ো কথা হলো এই নিঃশব্দ প্রতীক্ষা, সংযোগের এই ধ্যান।

না-লেখার একটা সান্ত্বনা মেলে এই গল্পে। মেলে, যদি সেই নিঃশব্দ বলয় থাকে আয়ত্তে, যদি থাকে প্রতীক্ষার সেই তীব্রতা আর অন্তর্মুখিতা। কিন্তু সেটা কোথায়? আর কারাই-বা সেই অ্যাবটরা?

ব ন ভি লা

খোলা পুবধারে সূর্য উঠছে, পশ্চিমে বিছানো আছে দূরান্তমণ্ডলে শালের বনে সবুজ, মাঝখানে মাঠের মধ্যে

এক ছোটো মেলা ঘিরে সাঁওতাল মেয়েরা সারি সারি কোমর জড়িয়ে নেচে চলেছে, ছেলেরা বাজাচ্ছে মাদল। এ হলো এদের চড়ক উৎসব, প্রজননের উৎসব, আমাদের চড়ক আর ঈদ পূজার ধরনধারণ মিলে আছে এর মধ্যে কিছুটা। বড়োরকমের কোনো উত্তেজনা নেই, এক-একটা দলে পনেরো-কুড়িটি মেয়ে (দশ থেকে সত্তর পর্যন্ত বয়স সেখানে বাঁধা) আধখানা চাঁদের আদলে গোল হয়ে ঘুরছে, কিন্তু ঘুরছে খুব মৃদু লয়ে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন ঠাণ্ডা এক জলস্রোত ক্ষীণ হয়ে এগিয়ে চলছে কোথাও। তার সঙ্গে খেলা করছে আরো একটা স্পন্দ। দৃষ্টিটাকে যদি অনুভূমিক না রেখে অনুলম্ব করে দেওয়া যায়, তাহলে মনে হবে অল্প হাওয়ায় ধানগাছ-গুলি দুলছে। এই দুই চালের ছন্দ, তার সঙ্গে সাঁওতালি কালো ভাস্কর্য, অগাধ সবুজের মধ্যে আলো ঝরে পড়ছে ওপরের ঝকমকে নীল থেকে, একশো রঙের পোশাক পরেছে ছেলেমেয়েরা সবাই, চোখের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো উৎসব আর কী হতে পারে!

কিন্তু গ্রামের নাম বনভিলা! খুবই আধুনিক নাম বলতে হবে।

কাল পড়ে দেখলাম যে ফ্রস্টের কবিতারও একটা প্রিয় প্রতিমা হলো পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়ি, অনধ্যুষিত। And that not dwelt in now by men and women! কিন্তু তাঁর এই আবর্তিত প্রতিমায় অডেন দেখেছেন মানুষেরই বীরত্বের ছবি, নিরাশা থেকে বাঁচবারই একটা পদ্ধতি। বিলেতে, বা ব্যাপকভাবে ইওরোপে, ও-ধরনের ধ্বংসছবি সমাজের অনাচার বা লোভ বা অহংকারের nemesis হিসেবে দেখা দেয় (শেলির ওজিমেণ্ডিয়াস যেমন?), ফ্রস্টের কবিতায় ঠিক তা নয়।

কিন্তু বাংলা কবিতায় এমন কিছু থাকলে আমরা কত সহজেই একে ধরে নেব পালিয়ে যাবার ছবি! ধরে নেব যে এসব প্রতিমায় আছে মানুষকে পছন্দ না করার সহ্য না করার ইঙ্গিত, নিতান্ত মানববিরোধী এর চরিত্র। একটা নির্দিষ্ট লেবেলে, একটা ফর্মুলার মোড়কে কত সহজেই বুঝিয়ে দেওয়া যায় কোনো কবিতা। এর যে অন্য কোনো জটিল গড়ন বা ভিন্ন উৎস থাকতেও পারে কোথাও, হতেও পারে কোনো শক্তি-

সঞ্চয়েরও কেন্দ্র, গোটা কবিতাবৃত্ত মিলিয়ে নিয়ে সেইটে আর বুঝতে চাইবেন কতজন পাঠক !

কে ক বি

অডেন দুঃখ করেছিলেন যে কবিতা লিখে যা উপার্জন করা যায় না, সেটা করা যায় কবিতা বিষয়ে কথাবার্তা লিখে ! উপার্জন বলতে অবশ্য একেবারে আর্থিকতাই বুঝেছিলেন অডেন, কোনো আত্মিকতা নয়। কবিতা লেখেন নিজের আনন্দে, কিন্তু প্রবন্ধ লিখবার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় সেইসব মানুষকে যাদের ভোটের জোরে তিনি অক্সফোর্ডের 'চেয়ার অর পোয়েট্রি'তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সাহিত্য বিষয়ে বলবার জন্য, লিখবার জন্য। এ নিতান্ত রবার্ট ফ্রস্টের 'আইড্‌ল্ ফেলো' হওয়া নয় (চিঠিতে সেদিন যেটা মনে করিয়ে দিয়েছে অশ্রু), এ রীতিমতো ফরমায়েসি সমালোচনা লেখা !

ফরমায়েস থাকলেই একটা প্রতিরোধ এসে যায়

মনে। কেন, তা বলা শক্ত। সে কি এইজন্যে যে 'আইড্‌ল্‌' হবারই একটা স্বাধীনতা খোঁজে মন? যার আলস্য থেকে শষ্পময় হয়ে ওঠে সময়, যার আলস্য থেকে সৃষ্টি হয়ে ওঠে অনেক কিছু, তাকে হয়তো এ প্রতিরোধ মানায়। কিন্তু যার আলস্য অক্ষম, নির্জীব, জাতকহীন? সে কি ফরমাসের ওপর ভর করে বসে থাকবে? তেমন-কোনো সময়েই কি শিল্পীরা ব্যবহার করতে চান বাইরের কোনো মাদক, ভিতরের মদ ফুরিয়ে যায় বলেই?

The Doors of Perception-এর মধ্যে অলডাস হাক্সলি লিখেছিলেন যে ড্রাগ ব্যবহার করলে তিনি মিস্টিকদের দিব্যদর্শন পেয়ে যান! গিন্‌স্‌বার্গেরা ভারতে এসেছিলেন এ-দেশি গাঁজার দৈবতা পরীক্ষা করতে। আর ষষ্ঠীব্রত কাল স্টেটসম্যান-এ লিখেছেন যে any amount of ganja বা l.s.d. তাঁকে এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পারবে না যে তিনি তিনি-ছাড়া আর অন্য কেউ! অর্থাৎ, হ্যাঁ বা না, দুই পক্ষের তর্কেই মূল চরিত্র হলো hypnosis, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কিছুরই দুয়ার খোলে না তাকে ছাড়া!

কিন্তু কবি কে? এই hypnosis-এ আচ্ছন্ন হয়ে আছেন যিনি, সর্বক্ষণ? একটি যদি সত্যিকারের কবিতা লেখেন কেউ, পাঠকের কাছে তিনিই তবে কবি। কিন্তু কবির নিজের কাছে? এই প্রশ্ন তুলে-ছিলেন একবার অডেন। বলেছিলেন একজন কেবল ততক্ষণই কবি, যতক্ষণ তিনি ঠিক করে নিচ্ছেন তাঁর শেষ লেখা কবিতাটিকে, দরকারমতো অদলবদল করছেন তার। এই কবিতা লেখার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কেবল একজন সম্ভাব্য কবি। আর এই কবিতা লেখার পরের মুহূর্ত থেকে তিনি এক বিগত কবি। কতদিন পর্যন্ত? যতদিন না আরো একটি লিখছেন তিনি। কিন্তু সে কি হবে আর, কখনো? অডেন প্রশ্ন করেছিলেন: will it ever happen again? উইল ইট এভার? উইল ইট এভার? যদি না-ঘটে আর, তা হলে মনে হতে পারে কারো, ইওনেস্কার মতো, সময় যেন গাধার পিঠে ভার হয়ে চেপে আছে!

আমি কি অনেক দূরে সরে গেছি? আমার hypnosis হবে কিসে?

এটা নিশ্চয়ই সেই বই যার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে। ম্যাকসিম গর্কির লেখা টলস্টয়ের জীবনচরিত, এইভাবে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠিক ঠিক তা নয় যদিও, টলস্টয়ের সঙ্গে কথাবার্তার টুকরো টুকরো বিবরণ কিছু, তাছাড়া বইটির শেষদিকে গর্কির চোখে-দেখা টলস্টয়ের চরিত্র-বিশ্লেষণও আছে। জীবনচরিত না বলে বলা যাক স্মৃতিলিপি।

এ-ধরনের বই অবশ্য আমাদের দেশে লেখা হবে না কখনো। আমরা মানুষকে হয় দেবতা করে তুলব, আজও, নইলে তাকে দেখাব পুরো মাপের শয়তান করে। আমি যাঁকে সীমাহীন শ্রদ্ধায় ভরে দিই, তাঁর মানবিক নানা স্খলনও যে চোখে পড়তে পারে আমার, সেই গহ্বরগুলি দেখবার পরেও যে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ প্রণত হতে পারি আমি, নির্বিকার পূজারীর এই দেশে এ-বোধটা পৌঁছতে আজও দেরি আছে।

গর্কির বইয়ের শেষ লাইনটি হলো 'ওঁর দিকে তাকিয়ে ভীরুর মতো ভাবছি, এই লোকটি ঈশ্বরের

মতো।' জানিয়ে দিতে ভোলেননি গর্কি যে ঈশ্বর তিনি মানেন না, তবু এই উচ্চারণ সম্ভব হলো তাঁর পক্ষে। অথচ গোটা বইটি জুড়ে টলস্টয়ের যে ছবি, তাতে কখনো তাঁকে মনে হয় সাধারণ মাপের মানুষ, কখনো মনে হয় অপকৃষ্ট। গর্কি অবাক হয়ে যান টলস্টয়ের অনেক ঐতরিক ব্যবহারে, অনেক আঘাত-কারী মন্তব্যে। গর্কির স্বপ্নবিবরণ শুনে সহজেই বলতে পারেন টলস্টয় : বানিয়ে বলছ। মেয়েদের বিষয়ে অশালীন ভাষায় কটুতম মন্তব্য করতে পারেন সহজেই। 'এক পা যখন কবরের দিকে, কেবল তখনই মেয়েদের বিষয়ে সত্যি কথাটা বলব, বলেই ঢাকনা দেব ফেলে, এবার যা খুশি করো!' শেকভদের সঙ্গে পার্কে বসে এসব কথা হালকা চালে বলে যান তিনি। আধুনিক লেখা দুর্বোধ্য, রুশীয় চরিত্রের সঙ্গে মেলে না একেবারে, জানিয়ে দেন। কবিতা যে আজকাল কী লেখা হচ্ছে তার মাথামুণ্ডু বোঝেন না কিছুই। পুশকিন ছাড়া আর কবিতা লিখল কে! ডস্টয়েভ্স্কির হলো না কিছু, কনফুসিয়স বা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিলে লোকটা ঠাণ্ডা হতো একটু, এই তাঁর মত। He

felt a great deal, but he thought poorly : মনে করেন টলস্টয়। আবর্জনা নিয়ে মাতামাতি করতে নেই সাহিত্যে, এই ধারণাটাকে চেপে ধরতেই সামলে নিয়ে বলেন : 'মুখ ফশকে বলে ফেলেছি, লিখো, সবই তো লিখতে হবে, সব।' নিজের পুরোনো লেখা পড়ে ('ফাদার সার্জিয়াস') তারিফ করেন খুব : বুড়ো লিখত ভালো। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' বিষয়ে জানান : 'এ তো ইলিয়াড একেবারে!' আবার, সাহিত্য যে মিথ্যে কথা বলে, সাহিত্যচর্চা যে অকর্তব্য — এও তাঁরই কথা।

এইসব, এবং আরো অনেক কিছু, এই নিয়ে যে মানুষটি, তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে ছেলেমানুষের মতো লুটিয়ে পড়েন গর্কি, অথবা তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবেন 'লোকটা ঈশ্বর', যদিও ঈশ্বর তিনি মানেন না। এও যে সম্ভব, আমাদের দেশে এই বোধটাই তৈরি হওয়া শক্ত।

সংগত একটা তর্ক তুলতে পারেন কেউ : কতদূর পযন্ত যেতে পারে এই পদ্ধতি। মোৎসার্ট বিষয়ে নতুন একটি বই ছাপা হয়েছে 'জীনিয়স অর ফেক'। 'হোল

ট্রুথ' বা সমগ্র সত্য প্রকাশের অভিমানে জীবনীরচনা কি কখনো কখনো ম্যাক্স ফেডারমানদের মতো এতটাই উত্তেজক বা সেন্‌সেশনাল হয়ে উঠতে চায়, হতে চায় প্রায় চরিত্রহননেরই তুল্য? ঈশ্বর থেকে একেবারে পুরো শয়তান? এ আবার এক উলটোদিকের ব্যভিচার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, মধ্যপথের একটা সামঞ্জস্য হওয়া যে সম্ভব, গর্কির লেখা তো তারই প্রমাণ।

চি ঠি প ত্র

কোন্ বই পড়তে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে? কারো স্মৃতিকথা বা জীবনী, ডায়েরি বা চিঠিপত্র, এসব যত টানে, এমন আর কিছু নয়। দোকানে বা লাইব্রেরিতে প্রথমেই লোভ হয় ওইগুলির দিকে হাত বাড়াতে। কেন এমন হয়? টমাস মানের এই চিঠিগুলি পড়তে পড়তে আরো একবার ভাবতে হলো সে-কথা। কেন এই পক্ষপাত? এর একটা কারণ কি মনের আলসেমি? দায়িত্ব নেবার অক্ষমতা? ভাবনাকে যে কোনোমতেই

সংবদ্ধ করে নিতে হয় না এখানে, টুকরো টুকরো কথায় ভর করে যে-কোনো জায়গায় ঝাঁপ দেওয়া যায় সহজে, সেই অবাধ স্বাধীনতার আনন্দই কি তৈরি করে দেয় এই আকর্ষণ? পল্লবগ্রাহিতার একটা মস্ত সুযোগ? ভেবে দেখতে গেলে, ছোটো একটা কবিতা বা গল্প পড়বার সময়েও মনকে গুছিয়ে নিতে হয় যতটা, যতটা নিতে হয় ঝুঁকি, এসব সময়ে তারও দরকার নেই কোনো। তাই, এটা হতেও পারে যে এ হলো অলস মনের সম্বল, অকর্মণ্যের বিলাস। অন্তত আমার নিজের পক্ষে তো সেইরকমই মনে হয়।

যে-কোনো পাতা ওলটাতে ওলটাতে অল্প-জানা কোনো লেখকের চারপাশে যে রঙরেবঙের চালচিত্র তৈরি হতে থাকে, ভালো লাগে সেটা। লেখককে বুঝবার জন্যে সে চালচিত্রের যে খুবই দরকার আছে তা না-ও হতে পারে। তবুও, জানলে মনে হয় না যে মানুষটির খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি অল্পসময়ের জন্য? অবশ্য, লোকে বলে যে প্রতিভাবানদের বেশি কাছাকাছি দাঁড়ানো বড়ো সুখের অভিজ্ঞতা নয়।

হয়তো। তবু ভালো লাগে যখন দুই ভাবুকের

সংলাপ শোনা যায় নানা চিঠিপত্রে—না, ঠিক সংলাপ নয়, এ তো আসে অনেকটা ড্রামাটিক মনোলোগের ধরনে। কেবল আঁচ করে নেওয়া যায় অন্য পক্ষের ভাবনাটা। এলোমেলো যে-কোনো পাতা খুললেই যদি দেখা যায় যে কথা চলছে বা তর্ক চলছে বা বিনিময় চলছে টমাস মানের মতো কোনো মানুষের সঙ্গে হাউপ্টমানের বা হোফমানস্টলের, আইনস্টাইন বা ফ্রয়েডের, স্টেফান ৎসাইগ বা হেরমান হেসের, কারেল চাপেক বা আপটন সিনক্লেয়ারের, জিদের বা ব্রেখ্‌টের—বেশ একটা উত্তেজনা হয় না? চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে জেগে উঠতে থাকে মানের রচনাজগতের সঙ্গে হিটলারের জার্মানি, মহাযুদ্ধের পৃথিবী। জেগে উঠতে থাকে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার পালিয়ে থাকবার দুঃখ, দেশের অতল সর্বনাশে প্রগাঢ় এক গ্লানির বোধ, কিন্তু তবু দেশের ভবিষ্যৎ বিষয়ে সাময়িকের সমস্ত পর্দা সরিয়ে দূরের স্বপ্ন দেখবার সামর্থ্য—যুদ্ধ শেষ হবার অল্প আগে ব্র্যাডলিকে যেমন লিখছেন মান, ইংরেজিতেই : যদিও দেশের ভবিষ্যতের কথা বলা যে-কোনো জার্মানের পক্ষে আজ শক্ত, তবু, the possibi-

lities of change and regeneration of a whole people are great and unforeseeable and therefore we shouldn't lose heart !

অথবা, এই যেমন ব্রেখ্‌টের কাছে লেখা মানের চিঠি। মার্কিন প্রবাসের দিনগুলিতে তিনি উত্তর দিচ্ছেন ব্রেখ্‌টের কোনো অনুযোগের। কী ছিল সেই অনুযোগ তা অবশ্য অনুমান করা যায় মানের কথা থেকে, কিন্তু ভালো হতো না কি যদি ব্রেখ্‌টের চিঠিটিও থাকত এই সঙ্গে ? হয়তো শক্ত ছিল সেটা প্রকাশকের বা সম্পাদকের পক্ষে। মান নিজেই যা লিখেছেন তারও তো মাত্র সামান্য একটা অংশই ছাপানো আছে এখানে, এর ওপর আবার তাও চাই যা তিনি পেয়েছেন ? (কেনই-বা নয় ? হঠাৎ মনে পড়ছে ইয়েট্‌সের কথা। ইয়েট্‌সের লেখা চিঠি, ইয়েট্‌সের কাছে লেখা চিঠির দুই ভিন্ন সংকলন কি পাইনি আমরা ? এ তো তবে অসম্ভব নয় একেবারে। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংকলন যেমন আছে, সেইরকম খুবই কি উচিত নয় রবীন্দ্র-

নাথকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিগুলিরও একটি সংকলন তৈরি করা ?

এক পক্ষের কথা পড়ে যাবার একটা মুশকিল এই যে তাঁর যুক্তিটাকেই নির্ভুল বলে মনে হতে থাকে। উপরন্তু আমি হচ্ছি 'জুলিয়াস সীজার'-এর সেই নাগরিকদের মতো, জোরালো আবেগের চাপে কোনো কথা শুনলে সেই মুহূর্তে সেটাকেই যাদের মনে হয় ঠিক। এখন যেমন মনে হচ্ছে, ঠিকই তো বলছেন মান। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বক্তৃতার ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ব্রেখ্‌ট, সেই মুহূর্তে মার্কিন প্রবাসী জার্মানদের দায়িত্ব নিয়ে ভাবনা ছিল তাঁর। কেবল তাঁর নয়, মানেরও। তিনি যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাতে বুর্জোয়া পৃথিবীর 'ইডিয়টিক প্যানিক ওভার কম্যুনিজম' নিয়ে ঠাট্টাও ছিল কিছু। যে জার্মানি অবশ্যই পরাভূত হবে, তার পাপ আর ধ্বংসের জন্য দায়ী যুদ্ধনায়ক আর শিল্পপতির দল, কিন্তু সেই জার্মানির সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে সুস্থ নতুন দেশের নিশ্চিত সম্ভাবনা, মনে হয়েছিল মানের। ব্রেখ্‌টকে তিনি জানাচ্ছেন, আমেরিকায় বসে এখনই কোনো 'ফ্রী

জার্মানি কমিটি' গড়ে তোলা ঠিক বলে মনে হয় না তাঁর। যেসব দেশ জার্মান অত্যাচারে বিধ্বস্ত এখন, বিস্রস্ত, তারা একে বিরূপ সন্দেহের চোখে দেখতে বাধ্য। 'তাঁর আগে চাই আমাদের সামরিক পরাভব' বলছেন টমাস মান।

কোনোই কারণ নেই হয়তো, তবু, 'লেট হার মিলিটারি ডিফিট টেক প্লেস' লাইনটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় এর কয়েক বছর আগে নোগুচির কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই শান্ত অভিশাপটির কথা তোমাদের সমগ্র জাতির জন্য আমি প্রার্থনা করি 'নট সাকসেস, বাট রিমোর্স'।

প্রা ই জ

এত আলসেমিই বা কেন? একটু মিলিয়ে পড়লে ক্ষতি কী? মানের ছোট্ট আত্মজীবনীটি তো হাতের কাছেই আছে, এই চিঠিপত্রগুলির পাশাপাশি আরেকবার তা পড়তে হয়তো ভালো লাগবে। 'আত্মজীবনী' বলা

উচিত কি না, সেও এক প্রশ্ন। কেননা, ঠিক-ঠিক আত্ম-জীবনী লিখতে ভয় ছিল ওঁর, এমন-কী উপন্যাসের আত্মজৈবনিক পদ্ধতি নিয়েও না কি দ্বিধা ছিল এক-সময়ে (আশ্চর্য!)—তবু যে লিখেছিলেন 'এ স্কেচ অব মাই লাইফ', সে কেবল নোবেল প্রাইজ পাবার পর পাঠকদের অল্পস্বল্প কৌতূহল মেটাবার জন্য।

এই আরেক কাণ্ড, প্রাইজ! কতরকম প্রতিক্রিয়া হয় কত মানুষের! এলিয়ট বলেছিলেন, প্রাইজ পাবার পর, 'এখন আর কেউ কবি বলে ভাবে না আমাকে, ভাবে এক সেলিব্রিটি।' জিদকে বলেছিলেন, সার্ত: 'আর তো কিছু পাবারও নেই, কিছু হারাবারও নেই আপনার? এবার নিশ্চয় স্বাধীন আপনি, যা-খুশি তাই লিখতে পারেন?' স্বাধীন? কিন্তু জিদের মনে হয়েছিল যে এই খ্যাতির দায় বাঁচানোই মস্ত একটা ভারের মতো। আবার এই জিদই এক যুগ আগে গর্বিত অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন মানকে তাঁর পুরস্কার পাওয়া নিয়ে। আর রবীন্দ্রনাথ—কিন্তু না, যে-কোনো কথা থেকেই রবীন্দ্রনাথে গড়িয়ে আসবার এই অভ্যাসটা ভালো না।

মানকে অবশ্য বিড়ম্বিত শোনায় না একেবারেই। আত্মজীবনীটিতে পড়েছি, সতেরো বছর পরে জার্মানির ভাগ্যে এসে পৌঁছল এই পুরস্কার, এজন্য তিনি খুশি। খুশি তিনি এই ভেবে যে এ-ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরী হলেন মমসেন, ফ্রাঁস, হাউপ্টমান বা হামসুনের মতো লেখকেরা। ১৯১৩ সাল থেকেই না কি নোবেল কমিটিতে জল্পনা চলছে তাঁর নাম নিয়ে, এ-খবরও জানেন তিনি। চিঠিতে লিখছেন জিদকে, 'ম্যাজিক মাউন্টেন' নিয়ে অনেক প্রশস্তি হচ্ছে যদিও, জিদও বলেছেন অনেক ভালো কথা, কিন্তু কেউ কেউ মনে করছেন ইন্টেলেক্‌টের কসরৎ ছাড়া ওর মধ্যে কিছু নেই আর, তাঁর পুরস্কৃত হবার কারণ কেবল 'বুডেন-ব্রুক্‌স্'। তাই যদি—একটু ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন তোলেন মান তাঁর আত্মকথায়—পঁচিশ বছর আগেই কেন পাননি তিনি পুরস্কার? না, 'ম্যাজিক মাউন্টেন' —যাকে তিনি মনে করেন 'এপিক অব কালচারাল ডেভেলপমেণ্ট'—তার বিষয়ে ওসব সমালোচকদের কথার কোনো মূল্য দেন না তিনি।

এই এপিক শব্দে হঠাৎ মনে পড়ছে স্টেফান ৎসাইগকে লেখা মানের দীপ্ত চিঠিটির কথা, যেখানে টলস্টয়কে তিনি তাঁর 'এপিক আইডিয়াল' বলে ঘোষণা করছেন আর তাঁকে তুলনা করছেন ডস্টয়েভ্স্কির সঙ্গে। তাঁর 'ক্ষীণ আধুনিকতা' নিয়ে তিনি আত্মীয়তা খুঁজে পান হোমার থেকে টলস্টয় পর্যন্ত সেই প্রাচীনদের জগতে, আর ডস্টয়েভ্স্কি—মহৎ ডস্টয়েভ্স্কি—তাঁকে তাঁর বলতে ইচ্ছে করে 'এ গ্রেট সিনার রাদার দ্যান এ গ্রেট আর্টিস্ট'। এই চিঠিরই অল্প পরে লেখা একটি প্রবন্ধে গর্বভরে মান উল্লেখ করবেন টলস্টয় বিষয়ে গর্কির সেই মন্তব্য : এই মানুষটি ঈশ্বরের মতো। কথাটা টলস্টয় বিষয়ে বলা যায়, গ্যোয়টে বিষয়ে বলা যায়। কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কি? না। তাঁকে সেইন্ট বলা যায়, কিন্তু ঈশ্বর নন তিনি। মনে হয়েছিল মানের।

এপিক আর ট্র্যাজিক। এই দুইয়ের মধ্যে যেন ভাগ করে দেওয়া আছে পৃথিবীর মন। টলস্টয় আর ডস্টয়েভ্স্কি যেন ভাগ করে নিয়েছিলেন তাঁদের কাজ, তাঁদের দুজনের মধ্য দিয়ে যেন গড়ে উঠছিল মানবাত্মার

এক সম্পূর্ণ অবয়ব। মান নিয়েছিলেন তার এক ভাগ, সেখানে টলস্টয়ই তাঁর পথদেখানোর ভার্জিল!

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা মানের কথা বলেন খুব, পছন্দই করেন তাঁকে, টলস্টয় বিষয়ে তাঁদের অনেকেরই তেমন উৎসাহ দেখিনি। এর মধ্যে কি অসংগতি আছে কোনো? কোনো ফাঁকি?

দা তা রা ম

দৈগন্তিক একটা বৃষ্টিভেজার অভিজ্ঞতা হলো কাল, যেন অনেকযুগের পর। সমস্ত আকাশ মাথায় নেমে আসছে। পৃথিবীকে যেন গুটিয়ে নিচ্ছে একটা কালোর মখমলে, আর তার পরেই বৃষ্টিতে ভরে যায় চারদিক, রবীন্দ্রভবন থেকে আমরা তখন খোয়াইয়ের দিকে। সঙ্গিনী ছিলেন একজন, প্রকৃতির সঙ্গে ঘন তাঁর পরিচয়। এ বৃষ্টিতে আরো কি আসবে না কেউ ঘর ছেড়ে? কিন্তু দেখা গেল না তেমন কাউকে আর। ফিরবার সময় মনে হলো কোনো পৌরাণিক যুগ

থেকে ফিরছি যেন, পায়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে গেরুয়া জল।

কেবল, ভবনের সেই শ্মশ্রুময় কর্মীটির আনন্দ ছিল খুব। অল্প বৃষ্টির সূচনায় বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছি যখন, এইরকম সংলাপ হলো কিছু : 'ভিজে যাবেন যে!' 'ভিজব বলেই বেরোচ্ছি।' 'ভিজবেন?' 'তাই তো ইচ্ছে।' 'বাঃ বেশ। ভালো, ভেজা বেশ ভালো, আমিও ভিজতাম আগে।'

আর আজ, ঢুকছি যখন ভবনে, তখন এই লোকটি আমাকে বিমূঢ় করে দিয়ে বলছে : 'ভিজলেন তো? ঠাণ্ডা লাগেনি তো? লাগে না বেশি ঠাণ্ডা। আর তাছাড়া, আমি কাল বাড়ি ফিরে প্রার্থনাও করেছি আপনাদের জন্য, যেন ঠাণ্ডা না লাগে।' দাতারাম বাল্মীকি এর নাম।

এই হলো আরেকরকম মানুষ। মানুষ, যেমন হতে পারত। মানুষ, যেমন হবার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে আমরা এমন হলাম কেন?

ভোরবেলায় আজ চলে গিয়েছিলাম সাঁইথিয়া হয়ে কোটাসুর নামের এক গ্রামে, বৈষ্ণব এক আশ্রম আছে ওখানে অনেকদিনের পুরোনো। বলছে তো দুশো বছর, তবে সমস্তটা লক্ষ করে ঠিক ততটাই বলে মনে হয় না।

পুরোনো-নতুনের একটা মজার সম্মেলন আছে এই আশ্রমটিতে। বৈষ্ণব বিনয়, প্রাচীন আতিথ্য, ধর্মসমাচার অথবা সদুক্তিকর্ণামৃত সবই ঘটছিল নিয়ম-মতো; কিন্তু সেইসঙ্গেই চলছিল নানা আমলের সাহিত্য রাজনীতি বা মানব সম্পর্কের বিদ্বেষবিচ্যুতি নিয়ে তির্যক মন্তব্য। বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের যে মানুষটি এখন দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে আছেন, তিনিই চালান একটি প্রেস এবং পত্রিকা, ওই আশ্রমের সঙ্গে জোড়া। স্বাভাবিক যে, চলতি জীবনটা ঢুকে পড়েছে তাঁর মন্দিরের চত্বরে!

আশ্রমের বাইরে, একটু দূরে, খানিকটা উঁচু তলে, বড়ো বড়ো অর্জুনের আর সেগুনের ঘনতার নিচে, মদনেশ্বরের মন্দির। একটা গোটা অঞ্চলকে

মনে হয় প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষ, মাটি খুঁড়লে এখনো যেন মিলতে পারে অতীত। একটা মন্দির তো নিশ্চয়ই আছে প্রোথিত, চুড়োটা তার জেগে আছে শুধু। আর, মদনেশ্বর নামে পুজো হয় যার সেও এক চমৎকার প্রাকৃতিক খেয়াল, পাথরের এমন বিচিত্র গড়ন দেখিনি কখনো আগে। ভূতাত্ত্বিক আর রাসায়নিকেরা নিশ্চয় ধরতে পারবেন খেলাটা, লোক-শ্রুতি এই যে পাথরের ওই গড়নটির ফাঁপা মধ্যাংশে জল ঢেলে দিলে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে হালকা ভূমি-কম্পের সম্ভাবনা থেকে যায়। বাইরে পড়ে আছে আরেকটা পাথরের চাঁই, গর্ত গর্ত করা। কিংবদন্তি কোনো? হাঁ, অবশ্যই আছে। ওই হলো বকাসুরের হাঁটুর অংশ; এইখানে এসে ভীম মেরেছিলেন তাকে, এই এখানকার লোকবিশ্বাস! কার সাধ্য তবে বলতে পারে পাণ্ডববর্জিত দেশ।

ভালো লাগল আজ এই সকাল, উদয়নের ঘরের ভিতর।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন ছিল আজ, ছিয়াশি বছর পূর্ণ হলো। এই বয়স, অথচ এখনো নিয়মমতো সকাল হলেই বসে পড়েন লেখাপড়া নিয়ে, লিখেই চলেছেন, করেই চলেছেন কাজ। আর আমাদের কী দশা, কেবল পালাবার ফিকির!

এই দিনটা নির্বাচন করে নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, এখানে এসে ওঁকে জগত্তারিণী পদক দেবার এই দিনটি ঠিক করেছিলেন ওঁরা। দেওয়া-নেওয়া, ভাষণ প্রতিভাষণ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালনায় যূথবদ্ধ গান।

কিন্তু ভালো যে লাগছিল তা হয়তো এসবের জন্যেই নয়। কারণ হয়তো আকাশ, আকাশের মেঘ। আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে পশ্চিমের বারান্দা টপ্‌কে দেখা যাচ্ছিল উদয়নের বাগান। ওই ঘরের মধ্যে, ওই আবহাওয়া, চোখে পড়ছিল পাতাগুলির মধ্য দিয়ে দূরের আকাশ।

আমার কাছে সেটা হয়ে উঠছে দূরের সময়। আমি তখন যেন বসে আছি কোনো অতিদূর পিছনদিনে। সে-সময়ে আমি ছিলাম না হয়তো, অথবা যখন এখানে আসবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না কোথাও, যে-দিনগুলির বিবরণ পড়েছি কত স্মৃতিকথায়, হঠাৎ যেন তেমনি একটা দিন উঠে আসছে আমার সামনে, একেবারে শূন্য থেকে, বর্তমানকে স্থাণু করে দিয়ে।

ব র্ষা

এমন কালো সকাল বর্ষাকালেও দেখিনি কখনো। শীত-শীত বাদলা। মনে হচ্ছিল আরো একটা স্মৃতিময় দিন বুঝি চলে এল হাতের মুঠোয়। কিন্তু ওরই সঙ্গে হঠাৎ একটা ভয় তৈরি হলো মনে। এইসব সময়ই তো দেশজোড়া প্লাবনের সময়?

অবশ্য, তেমন করে ভাবতে গেলে আমাদের সমস্ত নৈসর্গিক আনন্দই তো স্বার্থপরতা। কারো না কারো পক্ষে সেটা আঘাতময় হয়ে নামছেই। তাই বলে কি

আনন্দও পাচ্ছি না আমরা? সেটা কি এইজন্যে যে মূলত আমরা আত্মকেন্দ্রী?

কালো সময়

দুদিনের জন্য কলকাতায় গিয়ে, ফিরে এলাম আজ একমাস পর। একমাস আগে যখন লিখছিলাম 'এমন কালো সময় বর্ষাকালেও দেখিনি কখনো', তখন কি জানতাম শতাব্দীর ভীষণতম বৃষ্টি এগিয়ে আসছে গোটা দেশকে ভেঙে ফেলবার কাজে? বারোটা জেলা ভাসিয়ে নিয়ে গেল সাতাশ তারিখের জল, বিরাম-হারা তিনদিনের ধারাপাত, আর নদীগুলির বাঁধভাঙা খ্যাপামি। এবার আর দামোদর নয় শুধু, দামোদর অজয় রূপনারায়ণ ময়ূরাক্ষী, বাকি নেই কেউ।

এটা ভালো যে কলকাতাও এবার অল্পকিছু স্বাদ পেল বন্যার। ভালো, কেননা তা নইলে কলকাতার অনেক মানুষ ঠিক ধরতে পারে না দুঃখের মাপটা। দেশের যে-কোনো প্রান্তে দুর্গতির কথা জানলেই

ত্রাণের মিছিল অবশ্য বেরোয়, কিন্তু সেখানে দুর্গতি-নাশের দৃঢ়তার চেয়ে ত্রাণোৎসবের উৎসাহই হয় বড়ো। এবার আর তেমন ঘটতে পারেনি ঠিক, কেননা কলকাতাই এবার স্তব্ধ ছিল তিনদিন, ছিল জলের নিচে চুপ।

পুজোর জৌলুশ তবু ছিল না কি অনেক? এক কোটি লোক যখন ঘরছাড়া, কয়েক হাজার মানুষ যখন নিঃশেষ, আরো ভয়ের ভবিষ্যৎ যখন এগিয়ে আসছে, তখনো কিন্তু পূজামণ্ডপে দেখানো চলেছে 'আলোর খেলায় বন্যাত্রাণ'! সুনীল লিখেছেন আনন্দবাজারে, এইরকমই হওয়া উচিত, প্রাণের তো এইটেই সুলক্ষণ। একদিকে বন্যার জন্য মরিয়া কাজ করছে ছেলেরা, অন্যদিকে চলছে এই আনন্দযাপন, এ কি ভালো নয়? এতে তো ক্ষতি নেই কারো? দূরে লোকে মরছে বলে আমরা কি ভুলে গিয়েছি আমাদের দৈনন্দিন? হাসিখুশিও কি থাকছি না অনেকসময়েই? এইভাবেই তো বইতে দেওয়া চাই সর্বগ্রাসী সর্বংসহা জীবনকে!

এই হলো সুনীলের যুক্তি। এক হিসেবে তো

ঠিকই এই। কিন্তু যে তার সর্বনাশে তলিয়ে আছে, তার দিক থেকে দেখলে কেমন দাঁড়ায় এ-যুক্তির জোর? বুঝতে পারি না ঠিক। নির্য্যাতনের মুহূর্তে অন্য কোনো ত্রাণ যদি না-ও থাকে, একটা সঙ্গসান্ত্বনা পেতে চায় মন, দেখতে চায় একটা সমানুভব, ভাবতে চায় তার জন্য সমব্যথী আছে কেউ দূরে। তখন যদি উলটে দেখি যে আমি আছি জলের তলায় মুমূর্ষু আর শহরের মানুষ ফেটে পড়ছে ফুর্তিতে, দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে হতাশ্বাস। জলপাইগুড়ির বন্যায় বিপর্যস্ত পনেরোটা দিন কাটিয়ে দেওয়ালির কলকাতায় ফিরে গভীর বিহ্বল লেগেছিল দশ বছর আগে, শহুরে মানুষের আনন্দোল্লাসে। বাজিপোড়ানোর উৎসবে শুনেছি সেবার রেকর্ড করেছিল কলকাতা।

জানি না এবারও ঘটবে কি না সেটা। দেওয়ালি তো আসেনি এখনো। স্বাভাবিকমতো চলছে না এখনো ট্রেন, আসতে হলো টুকরো টুকরো করে। সোনালিসবুজে ভরে থাকবার কথা ছিল যার, সে আজ হয়ে আছে আবছা খয়েরি। টেলিগ্রাফের তারে তারে ঝুলছে কেবল ভাঙা কুঁড়ের চালা।

সবই কি মেঘের দোষ? আমাদের অকর্মণ্যতা, আমাদের অবিমৃশ্যতাই কি নেই এর পিছনে? ডি. ভি. সি.-র পরিকল্পনার দিনে, সেই কোন্ তিরিশ বছর আগেই কি ভয়াবহ এইসব সম্ভাবনার কথা বলেননি কপিল ভট্টাচার্য? সেদিন কেউ ভাবতে চাননি তাঁর পরামর্শ। আজ, এতদিন পর, কাগজে সেমিনারে দপ্তরে দপ্তরে ডাক পড়ছে সেই মানুষটির, বয়সের ভারে যিনি আজ ধ্বস্ত আর অসুস্থ, একদিন যাঁর সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করা গিয়েছিল কত সহজেই!

অ ব সা দ

অবসাদের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কেন যে কখন ঘা খায় মন, কোথা থেকে আসে এত স্তূপাকার ভেঙে-পড়া, এত নিস্তেজ অকর্মণ্য অর্থহীনতার বোধ, যেন একটা কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা। এই মুহূর্তে আরো একবার মনে হচ্ছে ভালো করিনি ভালো করিনি এখানে এসে, অথচ এমন নয় যে এটা মনে

করবার মতো প্রত্যক্ষ কোনো কারণ ছিল আজ। ওই ছেলেটুটি আমার সঙ্গে অপরিচয়ের ভঙ্গি করল বলেই কি এতটা? না কি ভিতরে ভিতরে এই অভিমানটা কাজ করছে যে প্রতিমুহূর্তে কেন নিজেকে প্রতিপন্ন করতে হবে অন্যের কাছে?

আর কিছু নয়, এ হলো দায়িত্ব থেকে পালাবার একটা ইচ্ছে। না, এ ঠিক কবিতালেখার মুহূর্ত নয়। না কি লেখা যাবে কিছু?

জ্যো তি রি ন্দ্র না থ, হ ঠা ৎ

কত কিছুই মিলে যায় এখানে, কত কিছুই এখনো পড়ে আছে আমাদের না-জানা। পাওয়া গেল হঠাৎ বেশ কয়েক ভল্যুম ডায়েরি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। ছাপা হয়নি, উল্লেখও করেননি কেউ, কিন্তু কতই তো লেখা হয়েছে তাঁকে নিয়ে। নিশ্চয়ই জানতে পারেননি তাঁরা যে এখানে জমে আছে তাঁদের জন্য অনেক উপকরণ, আরো কত আছে হয়তো এ-রকম!

কিছুদিন ধরে একটা ধারণা অন্যায়রকম প্রশ্রয় পাচ্ছে যে কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর পরই বিবাগী হয়ে গিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমন-কী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর যোগ হয়ে গিয়েছিল শূন্য অথবা ক্ষীণ। প্রমাণ হিসেবে কখনো-বা বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ যাননি কখনো রাঁচিতে মোরাদাবাদি পাহাড়ে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসেননি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। কিন্তু এসব সরলীকরণ কত ভয়াবহ! জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচিতে তাঁর নির্জন আশ্রয়ে দিনযাপন করেছেন ঠিকই, তবে সে হলো পারিবারিক দুর্যোগের দুদশক পরের কথা। ওই দুটি দশক তো পূর্ণ হয়ে আছে তাঁর ছবি আঁকায়, গানের চর্চায়, সংগীতপত্রিকার প্রকাশে বা সংগীতসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায়, অনুবাদে, প্রবন্ধে। আর, এর অনেকটাই আবার রবীন্দ্রনাথেরই সঙ্গে সাহচর্যে। তাঁদের যে পারিবারিক খাতাটি ছিল সকলের সবকিছু লিখবার বা মন্তব্য করবার অবাধ নির্ভর, সেখানে ১৮৮৮ সালের ১৬ নভেম্বর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'citizen' আর 'নাগর' শব্দ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, ১৭ তারিখে সেখানে রবীন্দ্রনাথ জুড়ে দেন 'রসিক কথাটার মধ্যে

নাগর শব্দের মত একটা মলিন ভাব আছে।' কিংবা খাবার টেবিল বিষয়ে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলে নেন জ্যোতিদাদার মতের কথা। ওই সময়ে, ১৭/১৮/১৯/২০ তারিখ জুড়ে কেবলই এঁদের কথোপ-কথন চলছিল এই খাতায়, সমাজ অথবা দর্শনের নানা প্রসঙ্গে, যা ছিল এই খাতাটির প্রত্যাশিত পদ্ধতি।

এই ডায়েরিগুলি হঠাৎ পেয়ে যাবার পর এ-বিষয়ে আরো কোনো কোনো তথ্যের সংযোজন করা যায় এখন। 'রবির ইংরাজিতে অনুবাদ গীতাঞ্জলি পেলুম' বা 'রবিকে চিঠি লিখলুম' ধরনের খবর এখন মাঝে মাঝে পাওয়া যাবে, ১৯০৮ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যবর্তী এই ডায়েরিগুলির মধ্যে। 'ডাকঘরে গিয়ে আমার আঁকা রবির স্কেচগুলো Book post-এ পাঠা-লুম' 'রবির চিঠি পেলুম—রথীর বিবাহে উপস্থিত হতে আমাদের অনুরোধ করেছেন' 'রথীর বিবাহ হয়ে গেল—প্রতিমা (কনে) মেয়েটি বেশ দেখতে' 'আজ রথীর বিবাহে বৌভাত' 'সকালে রবির বক্তৃতা বেশ হয়েছিল—"দুঃখের প্রয়োজন" এই বিষয়ে' 'Dwar-kin-দের ওখান থেকে রবির গাওয়া Phonogra-

ph record-এর list' 'রবির আসা হবে না' 'যোড়াসাঁকোয় গেলুম—রবি ও দিদির সঙ্গে দেখা হল' 'বিকালে রবি এসেছিলেন, রবি এখন লম্বা দাড়ী রেখেছেন' 'রবির ছবি আঁকলুম' 'রবির আর একটা চিঠি পেয়েছি' 'আজ রবি প্রতিমা রথী বিবি প্রমথ নলিনী সতী এখানে মধ্যাহ্নভোজন করলেন' 'শান্তিনিকেতন কাগজে দেখলুম—রবি Racine থেকে Berenice তর্জমা করেছেন' এইরকম অনেক অনেক অনেক টুকরো মন্তব্যের পর এই ধারণার প্রসার কি আর সংগত যে এঁরা দুজন পরস্পর বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে এসেছিলেন ?

ডায়েরিগুলি থেকে বোঝা যায় যে প্রতিদিনের ছিন্ন পরিচয় রেখে দেওয়াটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আযৌবন অভ্যাস। হাতে পাওয়া যাচ্ছে ১৯০৮ সাল থেকে, কিন্তু এর আগেও যে বিস্তর ছিল তার প্রমাণ আছে এই কথাটিতে যে 'আমার পুরাতন পোকা কাটা diaryগুলো পড়ে পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্চি !!' কথাটিতে বিস্ময়চিহ্নের যে যুগ্ম ব্যবহার আছে তা হয়তো একেবারে অকারণ নয়, লেখকের

দীর্ঘশ্বাস যেন ওই চিহ্নের মধ্যে তীব্র প্রচ্ছন্ন আছে মনে হয়।

দীর্ঘশ্বাসের অন্য একটা দিকও হয়তো শোনা যায় একটু লঘু কৌতুকের মধ্য দিয়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথ আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছোটো একটা কবিতাযুদ্ধ চলছিল ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে। কোনো প্রার্থীকে একবার ফেরাতে হয়েছিল বলে মনস্তাপে লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অর্থই অনর্থের মূল। জানতে পেরে আক্ষেপে-তর্জনে বড়দা তাঁকে ছন্দোবদ্ধ বিরুদ্ধ-কথন শোনান অনেক, আর শেষ পর্যন্ত লেখেন :

'অর্থ যদি অনরথ—ভাবি আমি তাই।
জ্যোতি তবে বড়দাদা, দ্বিজ ছোট ভাই।'

উত্তরও তৈরি হলো ছন্দে, আর তার অনেক কথার মধ্যে রইল এইসব ব্যথা

'যাচকেরা আসে কত হয়ে ভ্রান্তমতি
মনে ভাবে অবশ্যই ইনি লক্ষপতি
আসিলে ফিরাতে হয় হয়ে নিরুপায়
হৃদয় তখন শুধু করে হায় হায়

বাস্তবে থাকিলে অর্থ হতাম কৃতার্থ
অর্থের নিশান শুধু ঘটায় অনর্থ।'

জমিদারি আয় নেই, মাসোহারাও অল্প,

'এইসব জেনেশুনে তুমি বড়দাদা
কেমনে ধিক্কার দেও—লাগে মোর ধাঁধা।'

তখন বড়দাদার মনে পড়ে যে তিনিও তো একই 'ব্যথায় ব্যথী', কাজেই এবার তিনি বলতে পারেন :

'এবার যা লিখেছ অর্থে ভরা
আমিও ঐ রোগে জ্যান্তে মরা।'

অ প্রে ম

দিল্লী থেকে এসেছিলেন এক গল্পলেখক, তাঁর 'ইণ্ডিয়ান সিম্‌ফনি অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' সঙ্গে নিয়ে। পথে ঘুরতে ঘুরতে, ফ্রেস্কো দেখতে দেখতে, গাছপালার নিচে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশ দিয়ে চলতে চলতে, প্রশ্ন করেছিলেন হঠাৎ don't you think that love is a dead thing? a thing of the

past ? উত্তরে একটা জোরালো রকমের 'না' শুনে অট্টহাস্যে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন : Oh you incorrigible romantic !

হতাশ হলেন নিশ্চয়ই। ওই প্রশ্নের স্মার্টনেস যে অনেক পুরোনো হয়ে গেছে এতদিনে, সেটা বোধহয় ইনি খেয়াল করেননি। উত্তরে যদি বলতাম 'হ্যাঁ' তাহলে খুশি হয়ে ভাবতে পারতেন তাঁর মনের মতো একজন আধুনিককে পাওয়া গেল হাতের কাছে।

ব্যাপারটা এতই সহজ। ছোটোখাটো ফর্মুলা ঢুকে যায় আমাদের মগজের মধ্যে, তারপর সেইটের ওপর ভর করেই বাঁচতে চান এক-একজন লেখক ! পড়ে-পাওয়া একটা ধারণা থেকে জীবনটাকে দেখাই যেন তাঁর কাজ, যেন নিজের অভিজ্ঞতাকে নতুন কোনো ধারণার দিকে টেনে নেবার কোনো দায় নেই তাঁর। অপ্রেম, অসুখ, অ-, অ-, এইরকম দুচারটে অ-শব্দের পিছনে ঘুরতে পারলেই যেন রোম্যান্টিকতা থেকে সটান মুক্তি হলো। আসলে, এটাই যে একটা উলটোরকমে ঘুরিয়ে ধরা রোম্যান্টিকতা, সে-কথা অনেকের মন এড়িয়ে যায়।

এ থিং অব দি পাস্ট! কিন্তু কেমন করে জানা যায় তা? কেমন করে জানা যায় যে অতীতেরও সবই ছিল পরতে-পরতে ভালোবাসার টান? যাকে আজও ফাঁকি বলে ভাবি, আগেও যে তা ফাঁকি ছিল না, তার কি প্রমাণ আছে কোনো? হতে পারে যে সামাজিক কারণে আজ যাকে ফাঁকি বলে ঘোষণা করা সহজ, সেদিন তা ছিল না, কিন্তু তাই বলে তাকে সর্বসুখময় বলে কল্পনা করাও ঠিক নয়।

যেমন ঠিক নয় আজকের এই আত্মকেন্দ্রিক আহ্লাদেপনা, প্রতিমুহূর্তে কানের কাছে এই জপ: দেখো দেখো, তোমার প্রাপ্য তুমি পেলে না, দেখো তুমি বিচ্ছিন্ন বর্জিত নিষ্ফল। কেন? কেননা পৃথিবী থেকে না কি ভালোবাসার লোপ হয়ে গেছে।

না, যায়নি। যায়নি যে, সেটা প্রমাণ করবার জন্যই তো তোমাকে ভালোবাসতে হবে আরো, যুক্ত হতে হবে সমস্ত বিচ্ছেদ ভেঙে। বিচ্ছেদ কি নেই? পদে পদেই আছে, মুহূর্তে মুহূর্তে। বিশ্বাসঘাতকতা কি নেই? নিশ্চয়ই আছে, খুবই। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের সচেতন লড়াইটাও আছে। সেই লড়াইতে,

ভালোবাসার চেয়ে বড়ো আধুনিকতা আর কী হতে পারে মানুষের ?

ম ন

মনে মনে বলি : অন্যের কাছে যে আচরণ আশা করো, তেমনিভাবে গড়ে তোলো নিজের চলাফেরা। তাই বলে এর উলটোটা কিন্তু ঠিক নয়। যেমন আচরণ করতে চাও তুমি, ঠিক সেইটেই যেন আর আশা কোরো না অন্যদেরও কাছে। তেমন আশা করলেই আহত আর আক্রান্ত হবে মন।

এই বিবেচনাটা হলো মন ভালো রাখবার উপায়। উপায়টা কতদিন ধরে শেখাচ্ছি নিজেকে ; শিখছি না তবু ! মন কি অত সহজ ব্যাপার !

অমিয়বাবু চিঠি লিখেছেন রোগশয্যা থেকে, অস্পষ্ট দুর্বল অক্ষর, ক্লিষ্ট লেখা। উঁচু সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পিঠের হাড় ভেঙেছেন এই বয়সে! লিখেছেন, 'এ শাস্তি না প্রায়শ্চিত্ত?'

ওঁদের একটু ঈশ্বরঘেঁষা মন, তাই শাস্তি-প্রায়শ্চিত্তের ভাবনা সহজেই উঠে আসে মনে। কে দেয় শাস্তি? কিসের সে শাস্তি? কার প্রায়শ্চিত্ত? কেনই-বা? এসব প্রশ্নের কী উত্তর দেন ওঁরা, জানতে ইচ্ছে করে। ভিয়েৎনাম নিয়ে লিখেছেন যখন, তখনো 'মানবিক প্রায়শ্চিত্ত' ধরনের ভাবনাগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন, মনে পড়ে। এই-যে ইরানের প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে সমূলে ধ্বংস হলো গোটা একটা শহর, কিংবা এই-যে আবার বন্যার তাণ্ডবে পশ্চিম বাংলা ধ্বস্ত হলো, উদ্‌বাস্তুদের এই-যে পশুর মতো ত্রস্ত তাড়িত জীবন, একেও হয়তো কোনো শাস্তি-প্রায়শ্চিত্তের ধারণায় সাজিয়ে দেখা সম্ভব? মনে পড়ে বিহারের ভূমিকম্প নিয়ে গান্ধীজীর প্রায় অনুরূপ ঘোষণা। সেও না কি ছিল ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি, আমাদের

অস্পৃশ্যতার অমোঘ প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু নেহেরু তো আপত্তি করতে পেরেছিলেন তাঁর বাপুজীর এই অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক মন্তব্যে? আপত্তি তো করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? অমিয়বাবুও কেন পেরিয়ে যেতে পারবেন না এই শাস্তি-প্রায়শ্চিত্তের পৌরাণিক ধারণা?

জড় প্রকৃতি বা হিংস্র সমাজের অনিবার্য ফল হিসেবে যে জীবনের কত ঘটনা ঘটে, তাকে মেনে নিতে হয়তো কষ্ট পান এঁরা। তখন একটা আধ্যাত্মিকতার মণ্ডনে একে সাজিয়ে দেখলে হয়তো শান্তি হয় অনেক। কিন্তু এই অধ্যাত্মবিভা কি সত্যিই এঁদের চরিত্রের মর্মমূল থেকে উঠে আসে, না কি এ ওপরের একটা ছবি হয়ে থাকে শুধু? অন্তত লোকব্যবহারে যদি সেই বিভার কোনো প্রাত্যহিক প্রকাশ না থাকে, তাহলে বিশ্বাসের আর দাম রইল কী!

শান্তিদেব তাঁর দাওয়ায় বসে বলছিলেন কাল, দু-হাজার গানের মধ্যে 'গুরুদেব' দুঃখের গান লেখেননি বললেই চলে। পাশে ছিলেন আরো দুএকজন, কথাটাতে সবারই বেশ মত হলো। এখানে অন্তত দেখা যাচ্ছে আইয়ুবের ধারণার সঙ্গে কোনো অমিল নেই এঁদের। আইয়ুবও লিখেছিলেন একবার: রবীন্দ্রনাথের গানে আনন্দের কথাই বেশি, দুঃখ আছে কম।

'দুঃখ' শব্দটার ব্যবহার আর তাৎপর্য নিয়ে বোধহয় একটা ভুল ধারণা তৈরি হয় অনেকের মনে। এক হিসেবে এই তথ্য তো অস্বীকার করা শক্ত যে রবীন্দ্রনাথ দুঃখেরই উচ্চারণ করতে চান সবচেয়ে বেশি, পরিসংখ্যানেই তো প্রতিপন্ন করা যায় সেটা। কিন্তু তবু যে এঁদের এভাবে বলতে ইচ্ছে করে, তার কারণ হয়তো এই যে দুঃখের পথ আর দুঃখের পরিণামটাকে (কিংবা বলা যাক, দুঃখপরিণাম) এঁরা একাকার করে নেন ভাবনার মধ্যে। দুঃখ রবীন্দ্রনাথের পথ, কিন্তু আনন্দ তাঁর পরিণাম। দুঃখ হলো যা বাধা, যা অতিক্রম করে যাবার; যা অপরিহার্য, কিন্তু অলঙ্ঘ্য

নয়। আর অলঙ্ঘ্য যে নয়, এই বোধটাই মানবিক আনন্দের। এটাই শক্তির।

এভাবে যদি দেখেন সবাই, তাহলেই আর গানের মধ্যে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে হয় না গায়কগায়িকাকে। শান্তিদেবের মূল আপত্তিটা ছিল সেইখানে—আর খুবই সংগত সেই আপত্তি—যে, স্বরে-লয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা থেকে সরে যাচ্ছে যৌবনের তেজ, স্পর্ধা, প্রবলতা। ঘরের ভিতর থেকে তাঁর দরাজ গলার গান যখন দেয়াল ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছিল বাইরে, তখন বোঝা যায় তাঁর এই অভাববোধের বেদনা। ঠিক। কিন্তু তবু তো বুঝতে হবে যে দুঃখকে আত্মস্থ করার মধ্যেই আছে সেই তেজ, সেই প্রবলতা। দুঃখের বোধ মানেই দুঃখবিলাস মাত্র নয়, হাঁটুভাঙা কান্নাও নয় সেটা।

প্রা ক্ তি ক

সকাল শুরু হয়েছিল চাঁপাফুলে, রাত এল বেলফুল নিয়ে। প্রবোধবাবু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চাঁপাফুলের

থালা, আর এখন, এই রাত এগারোটার থই থই চাঁদের আলোয় শঙ্খ চৌধুরী রেখে গেলেন বেলফুলের বাটি। সাষ্টাঙ্গে প্রাকৃতিক! এ-রকম এক-একটা দিনে এই ভেবে কষ্ট হতে থাকে যে মুহূর্তপরেই এ আর থাকবে না। এইসব মুহূর্তই হলো অতীত ভবিষ্যৎ. আর বর্তমানের মিলনমুহূর্ত, নিমেষের মধ্যে সময়টাকে তখন ভাবীকালের দিকে সরিয়ে নিয়ে অতীত হিসেবে ভাবতে পারা যায়। আর তারই নাম তো সুন্দর! সময়ের সঙ্গে এটাই তো সুন্দরের যোগ!

কথাটা কেবল এ নয় যে প্রকৃতির আবেশে মুগ্ধ হওয়া গেল। চাঁপাফুল বেলফুল ভালো। ভালোই এই চাঁদের আলো আর হাওয়া। কিন্তু তারও চেয়ে ভালো মানুষে-মানুষে চকিত সম্পর্কের উত্থত এই ভঙ্গি, নিজের এই প্রসার। বেশিক্ষণ হয়তো থাকবে না এটা, এই সম্পর্কবিন্দুটা, কাল সকালে আবার নানা শুকনো জঞ্জালে লুকিয়ে যাবে এই মুহূর্ত, আবার সবাই ভাবতে শুরু করবে গ্লানির কথা বা হিংস্রতার কথা, হীনতা আর জৈবতার কথা কিন্তু কে বলল যে সেটাই সব। এটাই হলো প্রাকৃতিকতা। আর

এসব চাপের বাইরে হঠাৎ হঠাৎ চোখের কোণে যে মেঘ খেলে যায় একটু, সেই মেঘটাই মানবিক। তাকে কেন মিথ্যে বলে ভাবব? একদিনের সেই মেঘই তো আমাদের অনেকদিনের সম্বল হতে পারে?

পুলিন বিহারী আর শোভন লাল

আনন্দে নেচে ওঠা, সে তো একটা কথার কথা। সত্যিই তো আর নাচে না কেউ? কিন্তু নাচেও যে কখনো কখনো, তার একটা অভিজ্ঞতা হলো কাল।

বিকেলে যখন বেরিয়ে আসব রবীন্দ্রভবন থেকে, চোখে পড়ল পর্দাঢাকা ডানদিকের অংশটা। থমকে গেলাম হঠাৎ। মনে হচ্ছে না কারো জোড়া-পা একসঙ্গে শূন্যে উঠে নেমে আসছে আবার? ছুচারটে অস্ফুট শব্দও যে কানে পৌঁছচ্ছে সেটা খুব বড়ো কথা নয়, দৃশ্যটাই শুধু দুর্ভাবনার। দুর্ভাবনার, কেননা মনে হচ্ছে ওই পা-দুটি যেন আমার চেনা। আর সেটা যদি সত্যি হয়, যদি সত্যি হয় যে ওখানে পুলিনবাবুই

আছেন, তবে তো নিশ্চয়ই উনি প্রকৃতিস্থ নেই আর!' এই সত্তর বছর বয়সে, পর্দার আচ্ছাদনটুকু পেয়ে ও-রকম লাফাচ্ছেন কেন উনি? আজকাল কখনো কখনো ওঁর মন এত দীর্ণ থাকে, এত অস্থির, মাঝে মাঝে ভয় হয় যে অসুস্থ হয়ে পড়বেন হয়তো। সেটাই কি ঘটল?

অসংগতভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড। আর তারপর, নিরুদ্‌বেগ এক শান্তি নিয়ে বেরিয়ে এলাম পথে। ভয়ের কিছু নয়, ওটা ওঁদের বন্ধুদের মধ্যে নিভৃত কোনো আহ্লাদ। বোঝা গেল যে পাশে আছেন শোভনলাল, সর্বতোভাবে নিজেকে মুছে নেওয়া শোভনলাল, থামিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তিনি পুলিনবাবুকে, পারছেন না যদিও, ওঠা-নামা করছেই সেই পা, আর শোনা যাচ্ছে দুজনের অস্পষ্ট কিছু কাকলি।

সন্ধেবেলায় ওঁর ঘরে গিয়ে বললাম, 'লাফাচ্ছিলেন কেন ওভাবে, রবীন্দ্রভবনে?' চমকে উঠলেন উনি। তারপরেই অপ্রতিভ হেসে বললেন, 'দেখে ফেলেছেন? কী করে দেখলেন? বলবেন না যেন কাউকে।'

'আগে তো কারণটা শুনি, তারপর সেটা ভাবব। ডাক্তারকে খবর দিতে হবে কি না সেটাও তো ভাবতে হবে!' 'কেন? ডাক্তার কেন?' 'মাথা খারাপ হলে ডাক্তার চাই না?' হাসলেন পুলিনবাবু। বললেন, 'না, না, সেসব কিছু না। ব্যাপারটা জানেন না এখনো? টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে শোভনলালকে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধি দিয়েছে, তাই ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম। ভালো খবর না? আপনিও কাল বলবেন। নয়তো চিঠি লিখবেন। ওর মতো যোগ্য মানুষের কত প্রাপ্য ছিল। কেউ তো জানেও না ওর কথা। ওর যদিও তাতে ক্ষোভ নেই কিছু, দেবশিশুর মতো মানুষ! অপাপবিদ্ধ!'

পুলিনবিহারী বলে চলেছেন শোভনলালের কথা। আমি শুনছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলাম অন্য এক দিক। চকিত দুএকটা মুহূর্তে মানুষ কত সুন্দর হতে পারে! কত মানবিক! এটা ঠিক যে শোভনলালের মতো কোনো মানুষকে দিনের পর দিন চোখের সামনে দেখে যাওয়াটা একটা বড়ো অভিজ্ঞতা, এটা ঠিক যে তাঁর অনেক যোগ্য সমাদর হবার কথা

ছিল, ঠিক যে সামান্য স্বীকৃতিটুকুতে এই আনন্দ পাবার কারণ আছে, কিন্তু সপ্ততিবর্ষে পৌঁছবার পর বন্ধুর গর্বে বন্ধু আক্ষরিকভাবেই নেচে উঠছেন, এই দৃশ্যের পুণ্যে যেন চোখের অনেক পাপ ধুয়ে যায়। সত্যি তো এ উপাধিটা এমন-কিছু ব্যাপার নয়! কিন্তু মানুষের সম্পর্কের এই অনাবিলতা, এর চেয়ে বড়ো সৌন্দর্য আর কী হতে পারে!

শ্যা ম ল কৃ ষ্ণ ঘো ষ

প্রায় উলটোদিকেই থাকেন, যেতে-আসতে চোখেও পড়ে বারান্দায় বা ঘরে বসে-থাকা মানুষটিকে, কিন্তু কথা হয়নি এতদিন। প্রাথমিক জড়তায় কেটে গেল প্রায় সাত মাস। জড়তার এই শাপে কত কিছুই করা হয়ে ওঠে না, যা করবার যোগ্য ছিল, যা করবার কথা ছিল। এটা লজ্জার কথা যে শেষ পর্যন্ত উনিই এলেন একদিন, সঙ্গে ওঁর অনেকদিনের পুরোনো একটি বই : 'জঙ্গলে জঙ্গলে'।

চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের পুরোনো সময়টা এঁদের মধ্য দিয়ে একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'পরিচয়'-এর প্রসিদ্ধ আড্ডার প্রচ্ছন্ন এক সদস্য, তাঁর ডায়েরিতে আর তাঁর স্মৃতিতে যেন বেঁধে রেখেছেন সবটা। প্রচ্ছন্ন বলছি, কেননা তাঁর কথা লোকে জানে কম। এ-আড্ডায় অন্য যাঁরা বসতেন এসে, সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে, সুশোভন সরকার বা নীরেন রায়, হামফ্রে হাউস বা হিরণ সান্যাল—তাঁরা কি জানতেন যে তাঁদের তর্ক-মহাভারতের পাশাপাশি একজন গণেশও আছেন সঙ্গে? দিনের পর দিন আপনমনে 'পরিচয়'-এর সেই আলোচনাগুলির একটা নোট তৈরি রেখে শ্যামলকৃষ্ণ যে কত বড়ো একটা দায় যাপন করে গেছেন, সেটা ঠিকমতো বোঝা যাবে আরো কিছুদিন পরে, তাঁর বিস্তীর্ণ ডায়েরিগুলির সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটলে। তিরিশের যুগের কবিতার বা অন্য সাহিত্যকীর্তির একটা বড়ো পটভূমি সেখানে পাওয়া সম্ভব।

বলতে যাচ্ছিলাম যে এ-রকম ডায়েরি এখন আর কেউ রাখেন না (অবশ্য গোপনে গোপনে রাখেন

কি না তা আমি জানছিই-বা কেমন করে)—কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে সে-বিলাপটার তেমন-কোনো মানে নেই। প্রশ্ন হলো, ডায়েরি রাখবার যোগ্য সে-রকম আড্ডাই বা কোথায়? আত্মকেন্দ্রিকতায়, কূপমণ্ডূকতায়, বাণিজ্যিকতায়, পুরস্কারধন্যতায় সাহিত্যসমাজের সমস্ত মূর্তিটা এমন খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে যে স্ফূর্ত আর স্বাস্থ্যময় একটা সাহিত্যিক আড্ডাও আজ দুর্লভ। কলকাতার বাইরে পৃথিবী কি কোথাও আছে? কলেজ স্ট্রিটের বাইরে কলকাতা কি কোথাও আছে? কিংবা, আরো সংক্ষেপে, আমার বাইরে কলেজ স্ট্রিটও কি কোথাও আছে? এই হচ্ছে আজকের দিনের জীবনজিজ্ঞাসা।

এই চালাকিতৃপ্ত সফরীজগতের পাশে চুপচাপ এই পুরোনো মানুষদের দেখলে একটা স্নানের আনন্দ হয়। ভালোবাসেন গল্প করতে। সবিস্তারে শোনালেন, 'পরিচয়'-এর কোনো-এক আড্ডায় এক সাহেব ডাক্তার কীভাবে হিপনোটাইজ করেছিলেন ওঁকে, সেইসঙ্গে জানা গেল আফ্রিকায় ওঁর বাল্যবয়সী পারিবারিক জীবনের খানিকটা। দীর্ঘকাল ছিলেন সে-দেশে, তারই বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে 'জঙ্গলে জঙ্গলে' বইটি।

আর স্মৃতিরও কী তেজ ! প্রায় পঁচিশ বছর আগে 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এক সদ্যতরুণের কবিতা। নির্ভুল আউড়ে গেলেন তার কয়েকটা লাইন ! ভেবে দেখতে গেলে, যে-ভালোবাসার জোরে দিনের পর দিন তাঁর ডায়েরি লিখে যাওয়া, তারই তো অন্য এক প্রকাশ এই স্মৃতি !

আবৃত্তি কথা

কয়েকদিনের জন্য এসেছেন শম্ভু মিত্র, যেন অনিবার্যই ছিল যে আবৃত্তি নিয়ে একটা তর্ক গড়ে উঠবে আবার। হলোও একটা তাত্ত্বিক আলোচনার পত্তন, কিন্তু কোনো মীমাংসায় পৌঁছবে বলে মনে হয় না।

কবিরা যে অনেকসময়ে অন্যের গলায় নিজের কবিতার আবৃত্তি শুনে বিরক্ত হন, শম্ভুবাবুর ধারণা, তার একটা কারণ হলো অহংবোধ। আমার লেখাটা আর আমার রইল না, পেয়ে গেল একটা ভিন্ন চেহারা—এই না কি কবিদের ক্ষোভ। সত্যি না

কি? গোপন অবচেতনে কার কী পাপ লুকোনো আছে, সে-কথা আমি আর জানব কী করে। কিন্তু এতদিন তো এইরকমই আমার ধারণা ছিল যে নিজের লেখাকে অনেকের হয়ে উঠতে দেখলে ভালোই লাগে। অবশ্য, সেটাও নিশ্চয় আরেকরকমের অহং!

শম্ভু মিত্র বলতে চান, সমস্ত কবিতার মধ্যেই, সমস্ত উচ্চারণের মধ্যেই অনুভবের নাটকীয়তা আছে একটা। কবিতা পড়ার সময়ে সেটাকে গলায় না আনলে চলবে কী করে? কথাটা শুনতে নিরীহ লাগে, কিন্তু আসলে খুব গোলমেলে। নাটক তো সব কিছুর মধ্যে থাকেই, প্রশ্ন হচ্ছে, নাটুকেপনাও কি থাকে সব কিছুতে? নাটকীয়তা আর নাটুকেপনা যে এক কথা নয়, সেটাও কি এত করে বুঝিয়ে বলবার? ভিন্ন ধরনের কবিতা-পড়াকে ওঁরা বলেন চাপা রকমের পড়া। সেটা যে এঁরা তত পছন্দ করেন না, শ্রোতারাও পছন্দ করেন কম, তাতে হয়তো আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা প্রবণতা ধরা পড়ে। ইংরেজদের আণ্ডার-স্টেটমেণ্ট ওদের চরিত্র-সংগত, আর, একটু বাড়িয়ে না বললে কোনো কথাই

আমাদের জুৎসই লাগে না, ভাবি যে বলাই হলো না বুঝি।

কিন্তু এর চেয়ে একটা গূঢ় কথা বললেন শম্ভুবাবু, বললেন 'সময়'-এর কথা! ১৯৪৬-এর দাঙ্গার ভূমিকায় ওঁর 'যদিও সন্ধ্যা' আবৃত্তি বিশেষ-একটা মানে পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পড়ার ঠিক সেই গড়ন বজায় রেখে আজ আর শ্রোতাদের সঙ্গে তেমন কম্যুনিকেশন হতে পারে না, এই তাঁর অভিজ্ঞতা। হতে পারে না, তবু লোকে ভালো বলছে। তাহলে কি ভাবতে হবে না যে কাকে ভালো বলছে লোকে? প্রশ্ন করি আমি। কবিতাকে, না কবিতার উপস্থাপনাকে? আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আবৃত্তিকার কী চান? কবিতাটিরই কোনো কম্যুনিকেশন তো? সেটা ছাড়াও তবে আবৃত্তিকে ভালো বলতে পারে লোকে? আর সেইটে লক্ষ করে কবি যদি আতঙ্কিত হন তবে সেটা হবে কবির অহং-দোষ? প্রশ্ন করি, তাহলে কি ধরতে হবে যে 'দুঃস-ময়' কবিতাটি তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে এই তিরিশ বছরে? মনে হলো তর্কের প্রশ্রয়ে প্রায় তত দূরই পৌঁছতে চান উনি। বলতে চান যে ভাষা-

রীতির অনেকটা বদল হয়ে গেছে বলে ও-জিনিস আর গ্রাহ্য নয় আজকের শ্রোতাদের কাছে।

ভাষাপ্রসঙ্গে উঠে এল সাধু ক্রিয়াপদের কথা। বুদ্ধদেব বসুদের 'তুমি আসবে মেয়ে'-জাতীয় লাইন একটা ধাক্কা নিয়ে আসে, ধাক্কা দিয়েছিল, সাধু থেকে চলিত ক্রিয়ায় সরে আসবার ফলে। এর পর থেকেই না কি সাধু শুনলে আর নিতে চায় না পাঠকের মন। তাকে আর মনে হয় না আধুনিক বা নাগরিক। সত্যি? জীবনানন্দ? এইখানে একটু থমকে গেলেন উনি। 'এর মধ্যে একটু জটিলতা আছে' বলে এড়িয়ে যেতেই হলো। রবীন্দ্রনাথ? 'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম' কি বেশ আধুনিকই শোনায় না? বাচনে অসুবিধে আছে খুব? উনি অবশ্য বোঝাতে চাইলেন যে 'উঠিলাম'-এর ই-কারটাকে আসলে অল্প জায়গা দেওয়া হচ্ছে, উচ্চারণ করছি খুব আলতো করে। অন্য সাধু ক্রিয়ার সঙ্গে মেলে না ঠিক। কথাটায় জবরদস্তি আছে একটু। যা উনি হয়তো বলতে পারতেন তা হলো গোটা রচনার ভূমিকায় দেখলে ক্রিয়ার কথাটা ওখানে অবান্তর হয়ে যায়, বাক্‌স্পন্দের সহজ চালটাই ওর আধুনিক জোর।

অবশ্য এসব তর্ক নিষ্ফল হয়ে আসে অনেক রাতে, জ্যোৎস্নায় বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে যখন উনি ওঁর সম্ভাব্য নতুন সৃষ্টির কথা বলতে থাকেন, খোয়াইয়ের পশ্চাৎপটে সেই নিভৃত স্বপ্নকল্পনার উচ্চারণ প্রায় এক অবাস্তব ছবি তৈরি করে দেয়। 'চাঁদ বণিকের পালা'র মাপেও কুলোবে না, ভাবছেন এমন এক বিস্তীর্ণ গল্পের কথা, পুরাণ থেকে নেওয়া। আধুনিক পৃথিবীর কেন্দ্রীকরণ-বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা, নারী কীভাবে তার নারীত্ব রেখেই যোগ্য ভূমিকা পেতে পারে সমাজের চলনে, কীভাবে মানুষ জেনে নেবে তার আত্মপরিচয়, তার যোগ্য ভূমিকা কোথায়, এইসব ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠছে এক রচনার কল্পনা। আর ছন্দ? এও কি ছন্দে? হ্যাঁ, কিন্তু এবার আর দশ-চোদ্দর পয়ার কাঠামো নয়। এবার চেষ্টা করবেন তিন-পাঁচে সাজাতে, বিষম ছন্দে, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তে। সংলাপের কোনো অসুবিধে হবে না তাতে? হওয়াই সম্ভব, কিন্তু কী করে সেটাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, পরীক্ষা তো তারই!

যে-লেখা এখনো হয়নি, তার প্রতিশ্রুতির অমোঘ উচ্চারণ রইল এই শান্তিনিকেতনের বাতাসে!

কলকাতায় গিয়ে অনেকদিন পরে দেখা হলো আবার। খুব অনেকদিন কি? এই তো সেদিনও ক্রিকেট দেখেছি টি. ভি.-তে ওঁর ঘরে বসে। সজীব, হাস্যোচ্ছল, বাঙ্ময়। এই তো সেদিনও ভরাট উজ্জ্বলতায় কথা বলেছেন কত, কৌতুক করেছেন সবার সঙ্গে। মাঝখানের এই কয়েকটা মাত্র দিনে এত বদল হলো কী করে? কেবলই কি বয়েস?

পথের ধারে চেয়ার পেতে বসে আছেন বিকেলবেলায়, আমি চলেছিলাম আরেক বন্ধুর বাড়িতে, কিন্তু ওঁকে দেখে বসতে হলো সঙ্গে। খোলা গা, একমুখ দাড়ি, শরীরের শীর্ণ হয়ে আসা ছবিটা বেশ স্পষ্ট। আর তারও চেয়ে স্পষ্ট মনের অবসাদ। অল্প দুচারটি কথা বলতে গেলে চোখে এসে যায় জল, আবেগে ভরে যায় স্বর, যেন ব্যক্তিত্বেরই বদল হয়ে গেছে একটা। যেন এই পড়ন্ত বিকেলের অবসন্ন আভার সঙ্গে মিলে গেছে ওঁর এই নিষণ্ণতা।

সন্ধের দিকে গড়িয়ে আসছে বিকেল, আর রাধিকামোহন বলছেন তাঁর পুরোনো দিনের স্মৃতি।

কথাটা তুলেছিলাম আমিই, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে। হিন্দুস্থানী সংগীতের তানকর্তব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবনা, তা নিয়ে উনি কী বলেন, এইটেই আমি জানতে চেয়েছিলাম। তানকে কেবল অলংকার বলেই দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, অনেকসময়েই যে তা বাহুল্য অলংকারের মতো হয়ে দাঁড়ায় তা সত্যি, কিন্তু তান তো উঠে আসতে পারে সে-গানের গভীরতম সত্য থেকেও? ধূর্জটিপ্রসাদ একদিন সে-কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, বলেছিলেন যে রচনার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝে তানের মধ্য দিয়ে রচনারই রূপ উদঘাটন করেন 'পাকা ঘরানার খেয়ালিয়া'রা। এই বিষয়টিই আরেকটু বিস্তারে শুনতে পেলে মন্দ হতো না যেন। একটু তানবিস্তারে।

রাধিকাবাবু অবশ্য প্রশ্নটিকে বুঝলেন ভুল। অনিবার্যভাবেই চলে গেলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের গানে গায়কের স্বাধীনতার তর্কে, যে-তর্কে দিলীপকুমার রায়েরা উতলা ছিলেন একদিন। বললেন: 'এখানে আমি রবীন্দ্রনাথের মত মানি না।' বলেই বেশ গলা খেলিয়ে গাইতে শুরু করলেন, 'অল্প লইয়া থাকি তাই

'মোর যাহা যায় তাহা যায়', সুরের মধ্যে ঢেউ খেলল অনেক, বললেন জ্ঞান গোঁসাই-এর গল্প। অনেকদিনের জানা গল্প ওঁর মুখে শুনে ভালো লাগল কেবল এই-জন্যে যে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে পাওয়া যাচ্ছিল গানও। নজরুল কীভাবে ওই সুরে বসিয়ে দিলেন 'শূন্য এ বুকে পাখি' জ্ঞান গোঁসাইয়েরই জন্য, গেয়ে শোনালেন সেটা। অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে নজরুল এ গান লিখেছিলেন তাঁর প্রথম ছেলের অকালমৃত্যুর পর। আশ্চর্য এই যে, 'অল্প লইয়া থাকি' গানটি বিষয়েও কোনো কোনো মহলে শুনেছি একই ধরনের ভুল জল্পনা যে শমীন্দ্রের মৃত্যুকে নিয়ে বাঁধা ওই গান। অথচ ও-গান লেখা হয়েছিল সে-মৃত্যুর সাত বছর আগে!

গান শুনে পথচলতি লোকেরা থমকে দাঁড়ায় এক-বার, মুখ মুচকে চলে যায় কেউ, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা প্রায় ধরেই নেয় যে লোকটা খ্যাপা, কিন্তু বক্তার সে-দিকে খেয়াল নেই বড়ো। ও-গান থেকে উঠে এল নজরুলের কথা, অতুলপ্রসাদের কথা। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে উনি একদিন বাজাচ্ছেন ওঁর ঘরে,

দরজায় এসে হাজির এক মানুষ, জানা গেল তিনিই না কি অতুলপ্রসাদ। বললেন, এক মাসের জন্য তিনি এসেছেন সেই শহরে, এ একমাস রোজ সকালে তাঁকে একবার শুনিয়ে আসতে হবে বাজনা। শুনিয়েও ছিলেন তাই। কিন্তু পরে একবার, সমুদ্রের ধারে বসে বাজনা শুনবার শখ হয়েছিল ওঁর, দুচারবারের পর হাত জোড় করে বলেছিলেন রাধিকামোহন, আমাকে মাপ করুন। ঘরে বসে শোনাতে পারি, কিন্তু এখানে আর নয়। সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় আমার যন্ত্রের তার যাবে নষ্ট হয়ে। আর শুনেই—কোনো কারণ ছিল না যদিও—আমার মনে পড়ল বিশুর কথা, সে যখন বলছিল তার সমুদ্রের অগম পারের দূতী নন্দিনীকে, লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দেওয়ার কথা।

নজরুলও কিছু গান বেঁধেছিলেন ওঁর কোনো কোনো বাজনা শুনে। মনে আছে কি, কোন্ গান-গুলি? একটি অন্তত মনে করতে পারলেন সহজেই, আমার ছোটোবেলার ভারি প্রিয় এক গান শচীন-দেবের গলায়: কুহু কুহু কোয়েলিয়া কুহরিল মহুয়া-

বনে। উনি ফিরে গেছেন ওঁর যৌবনে, আমি ফিরে গেছি আমার কৈশোরে। গলির মধ্য দিয়ে আবছা আলোয় লোকচলাচল হচ্ছে যে বর্তমানে, গান যেন তাকে থামিয়ে রেখেছে হঠাৎ, জলরঙে আঁকা কোনো ধূসর ছবির মতো।

শৈলজারঞ্জন ১

কাল ছিল বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান। মুনিয়াকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন শৈলজারঞ্জন, অবশ্যই যেন যাই। এটা কি আর মনে করিয়ে দেবার? না গিয়ে আমার উপায় কী।

এ অনুষ্ঠানটা, বস্তুত, স্মৃতিযাপন। (অবশ্য, এক হিসেবে, গোটা শান্তিনিকেতন ব্যাপারটাই কি তাই নয়? অন্তত সেদিকেই কি স্পষ্ট নয় এর ঝোঁক?) ১৯৩৯ সালে বর্ষামঙ্গল উৎসব হয়েছিল একবার, শৈলজারঞ্জনেরই উপর ছিল তখন গান পরিচালনার ভার, গোটা সৃষ্টিটার সঙ্গে আদ্যন্ত জড়িয়ে ছিলেন

তিনি। এবারে, ভিজিটিং ফেলো হয়ে থাকবার এই সময়টিতে পুরোনো সেই সময়কে একবার ফিরিয়ে আনতে চাইছেন যেন। সেকালের লোক আজও দুচারজন আছেন যাঁরা এ সভায়, তাঁদের মনটা নিশ্চয় আনন্দকাতর হয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। আর আমাদের মতো অনেকের কাছে এ হলো ইতিহাসের যবনিকা ওঠানো, পুরোনো দিনকে নাটকে দেখা!

প্রায় নাটকেরই মতো হয়ে উঠল অনুষ্ঠান। কী-ভাবে শৈলজারঞ্জনেরা আবদার করলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে 'এবারকার বর্ষামঙ্গলের জন্য নতুন গান চাই', প্রত্যাহত করতে চেয়েও কীভাবে রবীন্দ্রনাথ অগত্যা মেনে নিলেন তাঁদের দাবি, ছদ্মযুক্তির জাল বিস্তার করে কীভাবে একটির পর একটি বাড়ানো হলো গানের সংখ্যা, সুরের তালের বৈচিত্র্যের ছলদাবিতে, সেই গোটা কাহিনীটা দ্বিপাক্ষিক সংলাপের মতো বলে চললেন শৈলজারঞ্জন, আর তার সঙ্গে শোনা হলো গানগুলিও আরেকবার। গাওয়া যে সবই খুব উঁচু-দরের হলো তা নয়, তবে বিশেষ এই আবহে সেদিকে হয়তো কারও নজরও ছিল না তেমন।

এ হলো সেই গানের গুচ্ছ, যার অনেকটাই ঈষৎ রূপান্তরিত হবে পরে, হয়ে উঠবে 'সানাই'-এর কবিতা। খুবই ব্যক্তিগত, নিভৃত, সুকুমার। কেমন হওয়া উচিত এ গানের পরিবেশন? শৈলজারঞ্জন পরিচালনা করছেন বলেই এ-প্রশ্নটা মনে আসে যে, কোনো-কোনো গান সম্মেলক গাইলে কি নষ্ট হয়ে যায় না তার চরিত্র? 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' অথবা 'এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও' কি সবাই মিলে গাইবার মতো গান? এখানে যে এভাবেই ঘটল তার কারণ কি এই যে অনেককে সুযোগ দিতে হবে একসঙ্গে? না কি এইজন্যে যে ১৯৩৯ সালেও হয়তো ওইরকমই হয়েছিল গাওয়া?

শৈলজারঞ্জন ২

ওইরকমই হয়েছিল গাওয়া, শৈলজারঞ্জন বললেন আজ সকালবেলায়। একেবারে কাছেই আছেন অথচ যাওয়া হয়নি এতদিন। এ-অনুষ্ঠানের পর দেখা করবার

একটা টান হলো। আর গিয়ে শোনাও গেল অনেক কথা।

বললেন, তখন তো খুব জোরালো একক গলা ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিলত না বেশি, কোরাসের চলটাই তাই অনিবার্য ছিল। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার সে-আসরে একলা গেয়েছিলেন ইন্দুলেখা, রাজেশ্বরী, এইরকম দুএকজন মাত্র। রাজেশ্বরীরই ছিল অনুষ্ঠানের শেষ গানটি 'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে'।

দুঃখ করলেন শৈলজারঞ্জন এবারকার শান্তি-নিকেতন নিয়ে। কমাসের দায় নিয়ে আছেন এখানে, শেখাতে যান সকালে তিনদিন, বিকেলে তিনদিন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে নিয়মিত আসে এমন নয়। কোনোদিন হয়তো ভরে গেল সব, কোনোদিন ফাঁকা। উনি বলছেন, আর আচমকা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে 'বিসর্জন'-এর লাইন, একটু ভিন্ন অর্থে : 'জানো কি একেলা কারে বলে ?···দিতে চাই, নিতে কেহ নাই !' একদিন না কি তবলা বাজাতে বলেছিলেন এক-জনকে, মুখের ওপর 'না' ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল সে !

'টাকা আর প্রচারেই আজ গ্রাস করেছে সব, শাসনও নেই শৃঙ্খলাও না। কিন্তু কার কাছে-বা বলব, কাকে নিয়ে-বা অভিযোগ করব! এরা তো সব নিজেরই ছেলেমেয়ের মতো।'

কথাগুলি শুনতে শুনতে মনে পড়ল, বাংলাদেশে গিয়েছিলাম বছর তিনেক আগে, আর শুনেছিলাম যে শৈলজারঞ্জনও তখন ওখানে। ঢাকায় যখন জানতে চাইলাম তাঁর সঙ্গে এখানে দেখা হবে কী করে, জানলাম উপায় নেই, কেননা উনি তখন চট্টগ্রামে। বাংলাদেশের শিল্পীরা বললেন, অল্পদিনের জন্যে তো পেয়েছি ওঁকে, তাই সকলেই শিখে নিচ্ছি যতটা পারি। ওঁর অবশ্য কষ্ট হচ্ছে খুব। কখনো খুলনা, কখনো ঢাকা, কখনো চট্টগ্রাম। কিন্তু আমরা তো তবু কিছু শিখতে পারছি।'

আর এখানে আমরা সর্বজ্ঞ, আত্মসম্পূর্ণ, প্রশ্নহীন। সকলেই জেনে গেছি চূড়ান্ত, শুধু জানাতেই যা-কিছু বাকি!

একটু পরে অমিতা সেন আর তাঁর দিদি এসে অভিনন্দন জানালেন শৈলজারঞ্জনকে, কালকের অনু-

ষ্ঠানে তাঁদের যৌবনদিন ফিরিয়ে দেবার জন্য। শুরু হলো ওঁদের তিনজনের অতীতচারণায় মুখর আলাপ, মাঝে মাঝে সংকোচ করছিলেন আমাকে ক্লান্ত করা হচ্ছে ভেবে, উপেক্ষা করা হচ্ছে ভেবে। ওঁরা জানেন না যে কেউ কেউ আমরা অক্লান্ত শুনে যেতে পারি সমস্ত তিরিশের সেই দিনগুলির কথা!

চীনে কবিতা আর রবীন্দ্রনাথ

কিছু তথ্য পাওয়া গেল প্যাট্রিসিয়া উবেরয়ের টুকরো এই লেখাটিতে। বিষয়টি নিয়ে বেশ বিস্তারেই অবশ্য কথা বলেছেন স্টিফেন হে তাঁর 'এশিয়ান আইডিয়াজ অব ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট' বইতে, কিন্তু ওর বাইরেও দুচারটি খবর জানা গেল এইখানে। জানা গেল ১৯১৫ সালের এক 'নবযৌবন' পত্রিকার কথা, সম্পাদক চেন-তু-সিউ যেখানে যুবকদের আহ্বান করছেন কনফুশিয়াসের আদর্শে জীবন গড়বার জন্য, টলস্টয় আর রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথকে,

আর সেইসঙ্গে টলস্টয়কেও, ভাবছিলেন তাঁরা এস-কেপিস্ট। মজা এই যে রবীন্দ্রনাথকে এঁরা ভাগ করে নিচ্ছিলেন যেন দুভাগে, একদিকে কবি আর অন্যদিকে ভাবুক। তাইওয়ানের যে-কবিটির সঙ্গে বন্ধুতা হয়েছিল আয়ওয়ার দিনগুলিতে, সে বলেছিল একদিন : 'কবি হিসেবে সরোজিনী নাইডুকেও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বরণীয় মনে হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন তাঁর ভাবুক সত্তায়।' কিন্তু সে-যুগের চীনদেশে এর উলটো ছবিরও প্রতিপত্তি দেখা যায় একটা। ছাত্র, মনীষী, রাজ-নীতিক, সমালোচক : এর অনেকেই প্রত্যাখ্যান করছিলেন জীবনবিষয়ক তাঁর ধারণা, দার্শনিক হিসেবে অনেকেই তাঁকে ভাবছিলেন রক্ষণশীল, এমন-কী প্রতিক্রিয়াশীল। প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদ বিষয়ে অতি-কথনে ক্ষুব্ধ ছিলেন তাঁরা, যাঁরা ভর করতে চাইছেন বস্তুবাদের ওপর। অন্যদিকে, কবি হিসেবে তাঁকে আধুনিকই ভাবছিলেন ওঁরা, কবিতায় তাঁরা প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্য লক্ষণেরই স্ফুরণ দেখছিলেন বেশি।

বিক্ষিপ্ত আর অসম্পূর্ণ অনুবাদের ওপর ভর করে

রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমতো বুঝে নেওয়া অবশ্য ওঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেদিন। ভালো বা মন্দের কোনো প্রতিক্রিয়াই তাই ঠিক নির্ভরযোগ্য হতে পারে না আমাদের কাছে। এই তথ্যগুলির তাৎপর্য আমাদের কাছে কেবল এইটুকু যে নানা চোখে দেখবার একটি ভঙ্গি পাওয়া যায় এর মধ্যে। একজন রবীন্দ্রনাথকে বুঝেছেন কেবল এইরকম: 'শিল্পের জীবন হলো সমানুভূতির জীবন, অপার সেই সমানুভূতিতে মিশে আছে প্রকৃতি আর মানুষ, আকাশের নক্ষত্র আর মেঘমণ্ডল, পাখির গান আর নদীর মর্মর, জীবন মৃত্যু মিলন বিরহ আনন্দ বেদনা এই হলো শিল্পের মূল অনুভব, সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মূল লক্ষ্য।' এই অনুভবকে লক্ষ করতে গিয়েই অনেকে তাঁরা জানেননি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সমাজ আর রাজনীতির ঘূর্ণনও কীভাবে কাজ করছিল এই মানুষটির কল্পনার মধ্যে।

কুড়ির দশকে পৌঁছেই অবশ্য কবিতার বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগল বামদক্ষিণ দুই শিবির থেকেই। একদিকে সোশ্যালিস্ট অন্যদিকে ফর্ম্যালিস্ট

তরুণেরা যা-কিছু চাইছিলেন কবিতার কাছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে খুঁজে পেলেন না তার কিছুই। লিখেছেন ওয়েন: 'রবীন্দ্রনাথের শিল্পে সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি এই যে বাস্তবের উপর কোনো দখল নেই তাঁর।' আমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে যে এদেশেও ঠিক ওই সময়ে রবীন্দ্রবিরোধিতা চলছিল প্রায় ওই একই ভাষায়, আর বারেবারেই রবীন্দ্রনাথকে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছিল পাঠকের সামনে। ওয়েন লিখেছেন: 'কোনো দার্শনিক কবি যদি বাস্তবের জ্ঞান হারান, মনে হয় কবি হিসেবে আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না তাঁর। ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতি জীবনকেই করে অস্বীকার, আর ঠিক-ঠিক বলতে গেলে, শিল্পসৃষ্টির পরিপন্থী সেই চিন্তা। রবীন্দ্রনাথের মন যে পুরোপুরি ভারতীয় তা অবশ্য নয়, কিন্তু তাঁর পশ্চিমি ভাবনাও অনেকটা ভাসা-ভাসা, অন্তঃস্থ ভারতীয় চেতনা তাই খুব-একটা পালটাতে পরেনি।···তাঁর ভাষা অন্য কোনো পৃথিবীর ভাষা, আমাদের এই মুহূর্তের জীবনের কোনো ভাষা নেই সেখানে।' সাময়িক রবীন্দ্রানুসরণের যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল চীনে কবিতায়, তার থেকে

বেরিয়ে আসবার জন্যে এই হচ্ছে ওয়েনের আহ্বান। প্রতিক্রিয়ার এই দুটো ধরনকেই একসঙ্গে লক্ষ করা চাই।

ভিক্টর ইউবুলিস

দুপুর থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া কখনো-বা। শীতের দিনে মেঘলা হয়ে জড়োসড়ো বসে আছি, শুনছি ভিক্টরের আত্মকথা।

লাটভিয়ার মানুষ, ইংরেজির অধ্যাপনা করেন; বাংলা শিখেছেন রবীন্দ্রনাথ পড়বেন বলে। রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে বই লিখেছেন একটি লাটভিয়ান ভাষায় আর সাহিত্য নিয়ে এখন লিখবার আয়োজন করছেন রুশ ভাষায়। এখানে থাকবার এই এক সুবিধে যে নানা দেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রায়ই, নিজেকেও কিছুটা ছড়ানো যায় বাইরে। সরল দীপ্র চেহারা ভিক্টরের, সহজ স্বাভাবিক মানুষ, বিনয়ী কিন্তু স্পষ্টবাদী। সৌরীন মিত্রের বইটি পড়তে

বলেছিলাম, পড়েও নিয়েছে দ্রুত, কিন্তু পড়বার পর ত্রস্ত বিব্রত প্রতিক্রিয়া জানাতে দ্বিধা করেনি কোনো। ভয়ে ভয়ে বলেছে : 'আমিও তো বিদেশী মানুষ। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ঈষৎ মাত্রও আপত্তি যদি তুলি, আমিও কি তবে অভিসন্ধিপরায়ণ বলে গণ্য হব?' বোঝাতে হলো তাকে, এই হচ্ছে আমাদের দেশের পূজক চরিত্রের সমস্যা, কিন্তু তবু অতটাই ভয় পাবার কারণ নেই নিশ্চয়।

ভিক্টর বলছে তার দেশের কথা, তার পরিবারের কথা। তার সাইবেরিয়ায় বেড়াবার কিছু কৌতুক-জনক অভিজ্ঞতা। মস্ত খোলা জায়গায় সারি সারি কয়েকটি তাঁবু খাটিয়ে কাটাতে হতো রাত, সারাদিন হেঁটে আসবার ক্লান্তির পর। ওইরকম এক রাত্রে একবার তাদের ঘুম ভেঙে যায় কোনো মহিলার আর্ত কান্নায়, কেননা চিনির লোভে বিরাট এক ভালুক সেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে থাবা দিয়ে নিয়ে গেছে মহিলাটির চুল!

স্ত্রীর বিষয়ে বলতে গিয়ে গর্বিত হয়ে ওঠে ভিক্টর। তার স্ত্রী ভাস্কর। দেখাল তার ছবি। দেখাল তার

ভাস্কর্যের ছবি। আর ভিক্টর, বহু ভাষাবিদ্, সাহিত্যের সক্ষম আর উৎসাহী অধ্যাপকপ্রধান, কবিতাও লেখে অল্পস্বল্প। লাটভিয়ান কবিতার সুদৃশ্য একটি সংকলন উপহার পাওয়া গেল তার হাত থেকে। এই সংকলনের এক কবি, ভিক্টরের বিবৃতিমতো, মনে করেন যে সমগ্র লাটভিয়ান কবির ওপর দুজন কবির মস্ত প্রভাব : পুশকিন আর রবীন্দ্রনাথ। মনে পড়ল আয়ওয়ার বন্ধু মার্ট ওগেনেরও কথা, যে-মার্ট বলেছিল তাদের স্লোভিন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ। মার্টও হাতে তুলে দিয়েছিল স্লোভিন কবিতার এক সংকলন। কিন্তু এরা মুখে যা বলে তা যদি সত্যি হবে তো লেখায় কেন কোনো চিহ্ন থাকে না তার? এসব সংকলনের গদ্যভূমিকায় এ-বিষয়ে কোনো মন্তব্য থাকে না কেন? এ কি সত্যাচরণ, না সৌজন্য মাত্র? এ কি কেবল বন্ধুত্বেরই কোনো মুদ্রা?

বক্তৃতা : ১

বেশ ভালো বললেন আজ সুব্রাহ্মণ্যম্। শিল্পের যথার্থ বোধ আর নম্রতার সঙ্গে মিলেছে বলবার ক্ষমতা। উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সকৌতুক চাপা উত্তর দিচ্ছিলেন যখন, ভালো লাগছিল আরো। সেমিনার ব্যাপারটার এই এক মুশকিল। ঔৎসুক্যের চেয়ে কৌতূহল সেখানে বেশি, জানবার ইচ্ছের চেয়ে যাচাই করবার ইচ্ছেটাই যেন বড়ো। এমন সেমিনার অল্পই দেখেছি যেখানে বিজ্ঞ শ্রোতারা কোনো বিনয় নিয়ে আসেন, নিজের গুরুগরিমা ভুলে কেবল বিষয়টির তদ্‌গত আকর্ষণেই আসেন। সেমিনার হলো পণ্ডিতদের টুপিতে আরো-একটা পালক গুঁজবার খেলা, বায়োডাটার ভল্যুম বাড়ানো। 'যিনি বলছেন তাঁর চেয়ে আমিই-বা কী কম জানি' এই হচ্ছে এখনকার পাণ্ডিত্যের আত্ম-জিজ্ঞাসা!

আজকের সমস্যাটা ছিল কলাভবন আর শিল্প-সদনের সাম্প্রতিক তাৎপর্য নিয়ে, ঐতিহ্যের সঙ্গে তার যোগের সমস্যা নিয়ে, ভবিষ্যতে তার ব্যবহারোপ-যোগিতা নিয়ে। খুবই ধীরভাবে যদিও এর সম্ভাবনা-

গুলি বিচার করলেন সুব্রাহ্মণ্যম্, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যাটাকে যে এড়িয়ে গেলেন সে কি ইচ্ছে করেই? স্মার্ট প্রশ্ন তুলেছিলেন একজন : শান্তিনিকেতনী রুচি কি বম্বে ফিল্মকে টপকে যেতে পারে বলে এই শিল্পী সত্যিই বিশ্বাস করেন? কথাটা আসলে এই যে ব্যাপকতর সমাজমাত্রার কথা ভুলে গিয়ে আমরা কি শান্তিনিকেতনের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কোনো বিচারই করতে পারি? দেশ জুড়ে যে কেবলই শান্তিনিকেতন নিয়ে হাহাকার ওঠে সে কি এই পরিপ্রেক্ষিতের অভাবেই নয়? রবীন্দ্রনাথ নেই আজ, নন্দলাল বসু নেই, সেটাই কি প্রধান সমস্যা? ইনি তো বলছেনই যে এঁরা একটা value system, একটা মূল্যমান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেইটেকেই আদল হিসেবে আমরা রাখতে পারি আমাদের সামনে। কিন্তু গোটা সমাজের ভ্যালু চলছে একদিকে, আর এখানে একটা বিচ্ছিন্ন ভ্যালুর সুচারু দ্বীপ তৈরি হবে, এটা কেমন করে আশা করা যায়? 'দ্বীপ' কথাটায় পৌঁছে মনে পড়ছে, শান্তিনিকেতনকে এ-রকম একটা দ্বীপের উপমাতে ভাবতে ভালোবাসতেন একসময়ে রবীন্দ্র-

নাথ, ইয়েট্‌সের ইনিসফ্রি দ্বীপের কথা মনে হতো তাঁর শান্তিনিকেতনকে ভাবতে গিয়ে। এই মনে হওয়াটার মধ্যেই যে একটা সংকট লুকোনো আছে, শেষ পর্যন্ত তা রবীন্দ্রনাথের কাছে কতটা স্পষ্ট হয়েছিল জানি না, কিন্তু জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে অমিয় চক্রবর্তীকে তাঁর লিখতে হচ্ছিল হতাশ চিঠি, শান্তিনিকেতন থেকেই ইয়েট্‌সের সেই দ্বীপটা কোথায় আছে বলতে পারো ?

বক্তৃতা : ২

কাল সন্ধ্যায় অরবিন্দনিলয়ে মন ভরে গেল মোহান্তির এক বক্তৃতা শুনে। হালকা আলোয় ভিজিয়ে দেবার মতো অনায়াস কথা বলা, কোথাও কোনো বাইরের জোর নেই, নিরভিমান স্পষ্টতা, যেন নিজের কাছেই সাজিয়ে তুলছেন সবটা বলবার এই ভঙ্গিটাই কত শিখবার মতো। দার্শনিকের যোগ্য এমন নিবিষ্টতা খুব কমই দেখতে পাই আমাদের চারপাশে।

বলছিলেন অরবিন্দের দর্শন। মনে হলো একদিনে অনেক জানলাম, অরবিন্দ বিষয়ে আরো একটু ভাববার প্রেরণা হলো। কেন এই মননের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র চিন্তাবিনিময় হয়নি কখনো, সেটা ভেবে আশ্চর্য লাগে।

যাঁরা জানেন এ-বিষয়ে, তাঁরাই ছিলেন বেশি। আর তাঁরাও বলছেন যে এত স্পষ্ট ধারণা ছিল না তাঁদের, সামগ্রিক অরবিন্দ বিষয়ে। তার মানে, একই সঙ্গে অভিজ্ঞ আর অনভিজ্ঞকে মুঠোয় ধরতে পারেন এই বক্তা। সেইটেই খুব শক্ত কাজ।

ডিনায়্যাল অব ম্যাটার আর ডিনায়্যাল অব স্পিরিট দুটোই মিথ্যে; ভুল, অরবিন্দের বিশ্লেষণে। এ দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আর যাওয়া-আসা আছে কোথাও। বিবর্তনের তত্ত্বে যে জড় থেকে চেতনের উদ্‌ভবের কথা বলা হয়, অরবিন্দ সেটা মানেন। তা যদি হয়, তাহলে তো জড়ের মধ্যেই চেতনের সম্ভাবনা রয়ে গেল। আবার, তা যদি হয়, তাহলে বিবর্তনের শেষ ধাপে আমরা যে পৌঁছইনি এখনো, তাও মানতে হয়। তখন মানতে হয় একটা

অধিচেতন জগতের সম্ভাবনাকে—সুপ্রামেণ্টাল স্টেট—যেখানে বিশ্ব একদিন পৌঁছবে। সেখানে আমাদের প্রচলিত সাবজেক্ট-অবজেক্টের ভেদ, ইন্‌টেলেক্‌ট্‌-ইন্‌টুইশানের ভেদ, ওয়ান-মেনি বা ইনডিভিজুয়াল-সোসাইটির ভেদ হয়ে যাবে লুপ্ত। সেইদিকেই জগতের গতি। তাহলে ব্যক্তিমানুষের করণীয় কী? এই বিশ্ব-বিধান ঘটবেই এটা জেনে নিয়ে সেই পথে নিজেকে উন্মুখ করে তোলা, কেবল নিজের মুক্তির জন্য নয়, সকলের জন্য, আর এইটেই অরবিন্দের যোগ। প্রায় এই লজিকেই—যদিও একেবারে উলটো দিক থেকে—মার্ক্সীয় বিধিতে ব্যক্তিমানুষের কর্তব্যনির্দেশ আছে: মোহান্তির বিবেচনায়।

এই জায়গাটায় অবশ্য খটকা আছে একটু। ব্যক্তি-মানুষ তো ভাবতেও পারে, এই যদি বিশ্ববিধান, এটা যদি হবেই, তাহলে তো আমি করলেও হবে, না-করলেও হবে। তাহলে আমি আর করতে যাই কেন। এ কি লোকপ্রচলিত গল্পের সেই আল্লাকে সাহায্য করবার মতো? ঝড়ে-জর্জর জীর্ণ কুটিরকে ধাক্কা দিচ্ছিল যে মিঞা সাহেব, আমাদের কি অবলম্বন হবে সেইটুকু লজিক?

বই লুকাচ

সলিলবাবুর সুবাদে আরেকটি নতুন বই এল হাতে : *Conversations with Lukacs*। 'পরিচয়'-এর প্রথম যুগ হলে এসব বই ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকায় পাওয়া যেত তার খবর, হয়তো এর সমালোচনা লিখতেন নীরেন রায় বা সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে। 'চতুরঙ্গ' সে-কাজ করেছে এক সময়ে, কিংবা সে-আমলের 'পূর্বাশা'। এখন আর কোনো পত্রিকার কথা ভাবতে পারি না যেখানে সদ্যপ্রকাশিত এসব বইয়ের কোনো পরিচয় পাওয়া যাবে। দেশীয় মনীষা বিষয়েই একটা ইঙ্গিত হয়তো-বা ধরা আছে এর মধ্যে।

ব্যাপারটা হলো চারজন পণ্ডিতের কাছে লুকাচের চারটি ইণ্টারভিউ। কিন্তু ইণ্টারভিউ না বলে কন-ভার্সেশন বলার একটা মানে আছে, কেননা এসব আলোচনায় প্রশ্ন যাঁরা তুলছেন, এক-দু-লাইনে প্রশ্নটা তুলে তাঁরা ছেড়ে দিচ্ছেন না কখনো, তাঁরাও কথা বলছেন সমস্যাটাকে নিয়েই, যেন দুজনের কথার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে একটা সামগ্রিক ভাবনা। আমাদের দেশে কখনোই এ-ধরনের ইণ্টারভিউর কথা পড়েছি

কি? মনে পড়ে না। আমাদের দেশে নিশ্চয় লুকাচ নেই, কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁদেরও সঙ্গে সমানে-সমানে কথা বলবার মতো আগ্রহী আর যোগ্য ভাবুকও আছেন কম। এখানে উঠে আসে একটা স্বপ্রাধান্যের অথবা আত্মম্ভরিতার অথবা বিচ্ছিন্নতার বিপদ।

এ-বইটির সবটা যে একবার পড়ে বুঝে নেব, সেটা অবশ্য হবার নয়। তবে এর একটা সুবিধে হচ্ছে অনেকদিন ধরে অল্পেঅল্পে কিছুটা স্বাদ পাওয়া যায়; অনেকদিনের সঙ্গী হয়ে থাকতে পারে। আপাতত টানছে এর দ্বিতীয় দিনের সংলাপ, লিও কফ্‌লারের সঙ্গে সমাজ আর ব্যক্তির দ্বন্দ্বসম্পর্কের বিচার। ডানিয়ুবের ধারে বড়ো একটি ঘরে বসে আছেন এঁরা, সামনের টেবিলে পানীয় আর টুকরোটাকরা খাবার, পিছনে সিলিং-পর্যন্ত বইঠাসা দেয়াল। সেখানে কথা হচ্ছে মনুষ্যত্ব নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, ইতিহাস আর রাজনীতি নিয়ে। নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঝাঁপ দিয়ে আসছে এক-একটা ভিন্ন জগৎ।

কথাপ্রসঙ্গে এসেছিল হাক্সলির *The Doors of Perception* বইটির নাম। (এইখানে ছোটো একটা

মজা আছে। 'নার্কোটিকের মহিমা কীর্তন করে একটি বই লিখেছেন হাক্সলি' কফ্‌লার এই পর্যন্ত বলতেই লুকাচ বলছেন 'জানি'। আর তখন কফ্‌লার 'জানেন? কী আপনি জানেন না লুকাচ? আমি ভাবছিলাম নিশ্চয়ই আপনার অজানা একটা তথ্য এখানে বলছি!') মুক্তির, ব্যক্তিগত মুক্তির একটা নতুন উপায় শুনিয়েছেন হাক্সলি নেশার মধ্যে দিয়ে। আর তার প্রভাবে আমেরিকায় (কেবল আমেরিকা-তেই নয় অবশ্য) চলছে এক 'ট্রানসেনডেনটাল জীবন'-এর ধ্যানচর্চা। এল. এস. ডি. দিয়ে যাওয়া যাবে ঈশ্বরের—অতএব সত্যের—কাছাকাছি, এই এক নতুন ঈশ্বরের ভয়ংকর আবির্ভাব!

কিন্তু একে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না লুকাচ। ঠিকমতো পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এ-ব্যাধির বিচার মার্ক্সীয় ভাবুকেরা এখনো করেননি, তাঁর ধারণা। ধর্ম বিষয়ে মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ এখনো যেন পড়ে আছে গত শতাব্দীর চারের দশকে। স্পেসে রকেট পৌঁছচ্ছে আর সেখানে ঈশ্বরের দেখা মিলছে না, কাজেই ঈশ্বরের মৃত্যু হলো ব্যাপারটা ঠিক তত সহজভাবে দেখার মানে নেই

আজ। ঠাট্টা করে বলছেন লুকাচ, টমাস অ্যাকুই-নাস বা দান্তেও যে-ভাবে ভাবতেন একসময়ে, একজন ধোপানীও আজ ঠিক সেইভাবে নিশ্চয় ঈশ্বর খোঁজে না। কেন দরকার ঈশ্বরের? ধর্মের? জীবনের যদি কোনো-একটা মানে নিজের চারপাশেই খুঁজে না পায় মানুষ, বিপন্ন সেই অর্থহীনতার মুখোমুখি তাকে খুঁজে নিতে হয় এক ধর্ম। শূন্যতার সামনে দাঁড়ানো মানুষ কখনো-কখনো তাই নির্বাচন করে নেয় ম্যাজিক, কিংবা নার্কোটিক। এমন-কী গারোদির মতো মানুষকেও কেন তেইয়ার দ্য শার্দ্যাঁর ভাবনার সঙ্গে নিজেকে মেলা-বার চেষ্টা করতে হয়, সে-কথাটা ধৈর্য ধরে বুঝতে হবে।

এই বোঝার চেষ্টায় লুকাচ মার্ক্সবাদ নিয়েই অন্য-রকম বড়ো প্রশ্ন তুলে বসেন। তাঁর মতে, বেশ জরুরি এই প্রশ্নের বিচার। গত শতাব্দীর শেষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল শ্রেণী-সংগ্রাম, যার চূড়া দেখেছি ১৯১৭ সালে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ থেকে নতুন একটা পরিবেশ তৈরি হতে চলেছে। পরিবর্তিত সেই পরিবেশে বাম-

পন্থী অধীর রাগী যুবকেরা দ্রুত বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে, দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে গেরিলা হতে চাইছে, কখনো হতে চাইছে চীনপন্থী। তাই মার্ক্সীয় ভাবুকদের এখন বিচার করে দেখতে হবে ক্যাপিটালিজমেরও এক ভিন্ন রূপের কথা, বৈপ্লবিক কাজকর্মের কোনো ভিন্ন এক পদ্ধতির কথা। অভ্যস্ত পদ্ধতিই যে একমাত্র পদ্ধতি নয়, সেকথা বিচার করে দেখবার সময় হয়েছে, সব দেশেই।

বই টলস্টয় অর সিনক্লেয়ার

হঠাৎ চোখে পড়ল টলস্টয়ের জার্নালের এক টুকরো, ১৮৯৬ সালের ১৯ জুলাই। চষা জমির মধ্যে দেখছেন একঝোপ কাঁটাগাছ, আর তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ফুল : 'ধুলোয় মলিন হয়ে আছে, কিন্তু তবু জীবন্ত রক্তাভ তার কেন্দ্র।···দেখে আমার ইচ্ছে হলো লিখবার। এ যেন শেষ পর্যন্ত জয় ঘোষণা করছে জীবনের, গোটা মাঠের মাঝখানে একাই কেমন করে বলছে এক জীবনের কথা।'

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এর সাতাশ বছর পরের অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন সময়ের মানুষ কখনো কখনো কতই একরকমের ভাবনা ভাবেন, লক্ষ করলে আশ্চর্য হতে হয়। রবীন্দ্রনাথও দেখেছিলেন লোহা-লক্কড়ের মধ্যে থেকে উঠে আসা একটি ফুলের গাছ, ছোটো একটি রক্তকরবী ফুল সেখানে যেন মাথা দুলিয়ে বলছে 'আমাকে মারতে পারলে কই', জড়ের বাধা ভেদ করে বেরিয়ে এল জীবন। এও সেই একই জীবনের জয়ঘোষণা, যার ছবি টলস্টয় দেখেছিলেন মাঠের কাঁটাগাছে।

এটা আকস্মিক, কিন্তু অন্য একটি বইয়ের ভাবনার সঙ্গে 'রক্তকরবী'র যোগ হয়তো তত আকস্মিক নয়। আপটন সিনক্লেয়ারের *The Brass Check* বইটিতে আছে : 'যৌবন বলছে, "জীবন সুন্দর, আনন্দময়। আলো দাও আমাকে, যেন ঠিক করতে পারি সব।" উত্তর আসে, "এই নাও অন্ধকার, বাধা পাও, পাথরে মাথা খুঁড়ে মরো।" যৌবন বলে, "আশা দাও।" উত্তর আসে, "এই নাও সংশয়।" যৌবন বলে, "বোঝাপড়ার শক্তি দাও, সবার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলতে পারি

যেন।" "নেকড়েদের মধ্যে নেকড়ে হয়ে বাঁচো" উত্তর আসে…'

আমাদের নাটকটির মধ্যেও আছে যৌবনের এই আর্তনাদ। নেকড়েদের মধ্যে নেকড়ে হয়ে বাঁচবার পরামর্শ অবশ্য নেই সেখানে, নেকড়েদের মধ্য দিয়ে লোহালক্কড়ের মধ্য দিয়ে জীবনকে জয়ী দেখানোই তার উদ্দেশ্য, কিন্তু এই অন্ধকারের পাথরের সংশয়ের মিথ্যাচারের প্রবঞ্চনার ব্যাপক এক ভয়াবহতায় ভরে আছে এর সমস্ত পরিবেশ। এই পরিবেশের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ জানছিলেন *The Brass Check*-এর জগতে বসেই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, ১৯২০-২১ সালের শিকাগো-নিউইয়র্ক থেকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি এর অনেক চিহ্ন ধরে আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে পড়ার অভিজ্ঞতাও তাঁকে জানাচ্ছিল কিছু। নাটকটি লিখবার সমকালেই সিন্‌ক্লেয়ারকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার কিছুটা অংশ তো এই 'তোমার সব বই পড়ার সুযোগ হয়নি এখনো, কিন্তু *The Brass Check* প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছিলাম [প্রকাশকাল ১৯১৯], আর পড়েই

মনে হয়েছিল যে জানতে হবে এই মানুষটিকে আর তাঁর সমস্ত লেখাপত্র।' কেননা ও-বইতে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো এক মানুষের মূর্তি। ঐশ্বর্যের আবদ্ধতা কী অপমান সঙ্গে নিয়ে আসে, এর শূন্যগর্ভ আস্ফালন, আত্মমর্যাদার মূলে এর আক্রমণ, এর অর্থহীনতা, ডলারবন্দী মানুষের উপর সমস্ত রকমের অভিশাপ, এই নিয়ে সিন্‌ক্লেয়ারের বই, আর সেইটেই যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'immediately made a bond of sympathy'। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, বহু বছর ধরে তিনি ভাবছেন ওই একই সমস্যার কথা, আধুনিক সভ্যতার এই পচনের কথা, 'and only a few weeks ago I have myself finished a Drama on the same subject'!

এর পর নিশ্চয় ভাবতে বাধা নেই যে *The Brass Check* কিছুটা কাজ করছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়। সিন্‌ক্লেয়ার অবশ্য ভালো বুঝতে পারেননি 'রক্তকরবী', ধরে নিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ এখানে আক্রমণ করেছেন কেবল বিজ্ঞানকে, কেবল যন্ত্রকে। কিন্তু 'রক্তকরবী'কে ঠিকমতো না বুঝবার সমস্যা কেবল

সিন্‌ক্লেয়ারেরই নয়, দেশবিদেশের অনেক সমালোচকেরই, অনেক পাঠকেরই। অথচ, এতই কি শক্ত ছিল্ক বইটা? এতই দুর্বোধ্য?

উইল ডুরাণ্ট

উইল ডুরাণ্টের উশকে-দেওয়া এই চিঠি! ঠিক চিঠিই নয় অবশ্য, বলা যায় প্রশ্ন। পৃথিবীর মনীষীদের কাছে উত্তর চেয়েছিলেন ডুরাণ্ট, ১৯৩১ সালের কোনো এক সময়ে। একই প্রশ্ন সেদিন তিনি পাঠিয়েছিলেন চার্চিল আর আইনস্টাইন, স্ট্যালিন আর টমাস মান, রাসেল বা হাউপ্টমান, ফ্রয়েড বা রবীন্দ্রনাথকে। জানতে চেয়েছিলেন, আধুনিক এই সময়ে মানুষের কাছে জীবনের আর কোন্ মানে আছে। দর্শনভাবনা নিয়ে লিখবার জন্য নিজেকে তখন তৈরি করছেন ডুরাণ্ট, তার আগে তাঁর দরকার ছিল এই প্রশ্নের মীমাংসা করে নেওয়া। কিন্তু মীমাংসা কি পেয়েছিলেন কোনো? চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি :

জ্যোতির্বিদরা আমাদের জানান এ-জীবন নক্ষত্র-লোকের কাছে সামান্য এক মুহূর্ত মাত্র, ভূতাত্ত্বিকেরা জানান সভ্যতা হলো টিঁকে থাকবার জন্য একের সঙ্গে অন্যের ক্ষান্তিহীন যুদ্ধ, ঐতিহাসিকেরা বলেন প্রগতির ধারণা নিতান্ত এক অলীক ধারণা, মনোবিদেরা বলেন পরিবেশ বা পরম্পরার হাতে আমরা কেবল যন্ত্র, যাকে বলি অক্ষয় আত্মা সে কেবল মস্তিষ্কের ক্ষণিক স্ফুরণ। শিল্প-বিপ্লবের পরেই ভেঙে গেছে মানুষের সব গৃহাশ্রয়, জন্মনিরোধের আবিষ্কারে ভেঙে গেছে নীতির বা পরিবারের ধারণা, প্রেম আজ কেবল শারীরিক সংঘর্ষ, বিবাহ এক সুবিধাজনক সাময়িক চুক্তি। গণতন্ত্রের দেখেছি অতল পতন, সমাজতন্ত্র যেন ইউটোপিয়া। সমস্ত আবিষ্কারই শুধু বাড়িয়ে চলে শক্তিমানের শক্তি, দুর্বলকে তা করে দুর্বলতর। কোনো দূরবীক্ষণে বা অনুবীক্ষণে ঈশ্বরকে আর মেলে না কোথাও, সমস্ত বেদনার আশ্রয় হতে পারতেন যে ঈশ্বর। তবে কি সত্যের আবিষ্কারই ছিল মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ভুল? বিজ্ঞান

আর দর্শন আমাদের এ কোথায় এনেছে আজ ?
সমস্ত মায়াবসানের এই বিস্তারের মধ্যে সান্ত্বনার
বা আনন্দের কোন্ উৎস আজ খুঁজে পান আধুনিক
কোনো শিল্পী বা মনীষী ?

এই কথাগুলি যখন তুলছেন ডুরাণ্ট, তখনো সভ্যতা দেখেনি হিটলারি নখদন্তের সম্পূর্ণ বিস্তার, তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংকটে পৌঁছয়নি পৃথিবী। তখন, এই প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়ে, তৈরি হচ্ছিল আধুনিকতার একটা একপেশে চেহারা। আকস্মিক জন্ম আর আকস্মিক মৃত্যুর মাঝখানে সীমায়িত এই জীবনের কোনো মানে হয়তো আছে তার সীমার বাইরে, একদিন মানুষ তা বিশ্বাস করেছে সহজে। বিশ্বাস করেছে যে কোথাও আছে এক পরম শৃঙ্খলা, এক ধারাবাহিকতা, বুদ্ধির অগোচর কোনো কল্যাণভরা অস্তিত্ব আছে হয়তো কোথাও। এই বিশ্বাসে একদিন তার সামনে ছিল কোনো ঈশ্বর। কিন্তু নীৎসে ঘোষণা করেন ঈশ্বরের মৃত্যু ; বলেন, আমরা হত্যা করেছি তাঁকে। সেই ঘোষণার পর অনেক অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এসে বিংশ শতাব্দীর ভারাক্রান্ত মানুষ তার চারদিকে

দেখে শুধু বিচ্ছিন্নের শুধু আকস্মিকের শুধু বিশৃঙ্খলার পুঞ্জ, জীবনের বাইরে জীবনের আর কোনো মানে খুঁজে পায় না সে। সে দেখে শুধু পাপের ছায়া শুধু দুঃখের ছায়া, শুধু ভগ্নস্তূপ আর শূন্য গহ্বর। লেখেন আমাদের সাম্প্রতিক কবি 'পাপ আর দুঃখের কথা ছাড়া কিছুই থাকে না।'

কিছুই থাকে না আর? এইটেই ছিল মনীষীদের কাছে ডুরাণ্টের প্রশ্ন। মনীষীরা কী উত্তর দিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু ডুরাণ্ট নিজে তো তাঁর 'দর্শনের কাহিনী'তে পেয়ে গিয়েছিলেন এক নির্ভর, যে-নির্ভর নিয়ে বলেন 'বয়ঃসন্ধির আকস্মিক অভিজ্ঞতার সামনে এসে তরুণেরা যেমন হয়, আমরা আজ তেমনি বিপর্যস্ত, ভারসাম্যহারা। কিন্তু পরিণতি আসবে শিগ-গিরই, শরীরে মনে সামঞ্জস্য হবে একদিন, সামঞ্জস্য হবে আমাদের প্রাপ্তির সঙ্গে আমাদের সভ্যতার।' প্রশ্ন এই, কীভাবে পৌঁছলেন তিনি এই নির্ভরে! বিশ্বাস হারানো পাপ বলেই কি এই বিশ্বাস?

কিছুই আমার মনের মতো নয় : কোনো কোনো মানুষ কত সহজেই একথা ভেবে নিতে পারে। প্রত্যাখ্যান করবার, অবজ্ঞা করবার, অপছন্দ করবার হাজার রকম অবস্থা আমাদের সামনে ছড়ানো আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে বড়ো হতভাগ্য যার কাছে সবটাই কেবল তাই। এটা তো ঠিকই যে শাদায়-কালোয় ভরে আছে সংসার। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্‌টাকে দেখতে চাই আমি, শাদাটাকেই না কালোটা। গেস্‌টল্‌ট্‌ সাইকোলজিতে যেমন একটা নকশার খেলা আছে, একই ছকের মধ্যে দুটো নকশা ধরা পড়তে পারে চোখে, কোন্‌টা কে দেখে এই নিয়ে খেলা। কিংবা, ভাবা যায় 'রাজা' নাটকের কথা, সেই সংলাপ যে 'মন যদি তার মতো হয় তবে সে মনের মতো হবে।' শুনে প্রথমেই মনে হতে পারে যেন কোনো কথার খেলা, কেননা 'মন তার মতো হবে' কথাটার কী আর মানে হতে পারে, এ তো একটা জুলুমের মতো। কিন্তু সত্যি সত্যি ভেবে দেখতে গেলে, আমরা তো করতেও পারি সেটা, মনকে একটু একটু করে গড়ে তুলতে

পারি গ্রহিষ্ণু আর সহিষ্ণু, সেখানে ক্ষয় আর বঞ্চনাটাই একমাত্র হয়ে দেখা দেয় না, যেখানে একটা প্রসাদও এসে পৌঁছয়, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ভালো লাগারও কথা বলতে পারি। খুব কি কঠিন সেটা?

খুব যে কঠিন নয়, দুএকজনকে দেখে সেটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। শ্যামল লাবণ্যে ভরা এই সান্ত্বনা মেয়েটি যেমন। সুস্মিতা হয়ে একদিন সে প্রশ্ন করেছিল 'শান্তিনিকেতন আর আগের মতো নেই, এই নিয়ে বিলাপ করে সবাই। কেন এত বিলাপ? আপনার ভালো লাগে না শান্তিনিকেতন? আমার তো আজও খুব ভালো লাগে এই গাছপালা, ছোটো ছোটো এই ছেলেমেয়ের দল, বড়োরাও কত জনে কতরকমের কাজ করছেন, খুব-একটা অন্যরকম আবহাওয়া না? আর কোথাও কি আছে এমন? যে যা বলে বলুক, আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে।' যারা অন্যরকম বলে তাদের বিষয়ে কোনো রোষ বা বিতৃষ্ণা নিয়ে নয়, একটা স্নিগ্ধ ঔদাস্যে তাদের আলতো করে নিয়েই এ-কথা অনায়াসে বলতে পারে শান্তিনিকেতনের এই মেয়ে।

কোনো কোনো মানুষ আছে যাদের কথার সত্য তাদের সমস্ত অবয়বের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, সেখানে কোনো ফাঁক নেই ফাঁকি নেই। এ হলো সেইরকম এক সত্যের উচ্চারণ, অসামান্য এর দ্যুতি। ভেবে দেখি, আমারও মধ্যে লুকোনো ছিল হয়তো সংশয়ের সংকোচের অনেক প্রত্যাখ্যান, সমালোচনার বিরূপতা, বিলাপ। সান্ত্বনার এই প্রশ্ন তো কোনো প্রশ্ন নয়, আমার কাছে এ এসে পৌঁছয় যেন কোনো পরামর্শের মতো। যেন খুব সহজে এই মেয়েটি আমার মধ্যে এনে দিতে পারছে ভালো লাগাবার কোনো শক্তি, অথবা বলা যায়, ওর নামের অর্থকে সত্য করে তুলে আমাদের অনেক ক্ষোভের উপরে ও এনে দিচ্ছে কোনো সান্ত্বনার প্রলেপ।

প্রাকৃতিক আর মানবিক শিল্পের রমণীয়তায় এখন ভরে আছে এই অঞ্চল। রামকিংকরেরই কত-না প্রবল ভাস্কর্য ছড়ানো আছে এখানে-ওখানে। কিন্তু এর কোনো একটির কথা যদি বলতে হয় শুধু, আমি বলব সুজাতা মূর্তিটির কথা, সংগীতভবন আর পুরোনো কলাভবনের লগ্ন গাছের গুঁড়িগুলির মধ্যে

মিলিয়ে-থাকা সেই দীপ্র লাবণ্যের মূর্তি। মূর্তিটির শিল্পসৌন্দর্যের জন্যই যে বিশেষ করে বলব এর কথা. তা নয়। বলব এইজন্যে যে এখানে এই মূর্তিটিই পরিবেশের সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে গিয়ে সবচেয়ে স্বাভাবিক আর সেই কারণে সবচেয়ে স্বতন্ত্র।

তেমনি এক স্বাভাবিকতায় এই মেয়েটিও যেন আত্মস্থ হয়ে আছে শান্তিনিকেতনের প্রত্যাশিত চরিত্রের মধ্যে, ওকে দেখলে এইরকম মনে হয়। এদের মতো মানুষকে নিয়েই তো তৈরি হয় ঠিক-ঠিক মানুষের সমাজ?

সর্বোচ্চ

'ভালোবাসা সকলের চেয়ে বড়ো, এটা কেন লিখলেন আপনি? আপনিও কি তাহলে হায়ারার্কিকাল হয়ে পড়লেন? কোনো একটি সর্বোচ্চে, কোনো পিরামিড-শৃঙ্গে কি তাহলে আপনারা আস্থা রয়েছে?' চিঠিতে পার্থর জিজ্ঞাসা। নিজের মতো করে ভাবতে পারে

পার্থ, বইপড়া দিয়ে নয়, বেঁচে-থাকা দিয়ে তুলে আনতে জানে প্রশ্ন, তাই এড়িয়ে যাওয়া যায় না কথাটাকে। না, তেমন কোনো শৃঙ্গকল্পনা নেই আমার, যেখানে সব চূড়ান্ত। ঠিক। কিন্তু পরিবর্তমানতা আছে, একবিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে চলমানতা আছে। এক মুহূর্তের হ্যাঁ বিপরীতের আঘাতে ভেঙে পড়ে যায়, না-এর পর না আসে, তার থেকে জেগে-ওঠা হ্যাঁ বলে যাকে ভাবি তাকেই আবার ভাঙতে থাকি পরের মুহূর্তে আরেকরকম না-এর আঘাতে, আর এইভাবে যে চলা সেটা উচ্চতর থেকে উচ্চতমে নয়, অন্য থেকে অন্যতরে শুধু। এই অন্যতরের আছে বিকাশ, প্রস্ফুটন আছে, আছে ক্রমিক স্ফুরণ, কিন্তু শেষ নেই কোনো। তাহলে কেন ভালোবাসা সকলের চেয়ে বড়ো? সেটা এই-জন্যে এই অর্থে যে, এই বিন্দুগুলির চূড়ান্তহীনতার পক্ষে সে এক আন্তরিক নির্ভর, সবচেয়ে বড়ো আলম্বন। অগাধ শূন্যতার বেষ্টনের মধ্যে আমরা আছি, কিন্তু এই 'আছি' কথাটাকে ত্রিমাত্রিক করে তুলবার জন্য না-আমির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের যে যোগ চায়

'আমি', তারই নাম ভালোবাসা। আমি, না-আমি, আর এর সম্পর্ক, এই নিয়ে আমাদের 'আছি'র বোধ। আর 'আছি' কথাটা যদি হয় ধারণাতীত এই ভাসমান শূন্যতায় প্রবাহিত নৌকোর মতো, তবে তাকে বেয়ে নেবার জন্য ভালোবাসাই শুধু চাই, তাই ভালোবাসা বড়ো।

তেইয়ার দ্য শার্দ্যাঁর মতো মানুষেরা অবশ্য ভাবতে পারতেন যে বিশ্বশীর্ষে আছে এই ভালোবাসার কোনো পরম উৎস, কোনো পরম লক্ষ্য ভালোবাসার। রহস্যময় সেই কেন্দ্রের তিনি নাম দিয়েছিলেন ওমেগা, যেন সেই উচ্চতম থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে সব। না, তেমন কোনো শীর্ষকেন্দ্রকেও দেখতে পাই না আমি, কিন্তু দেখতে পাই প্রাণনার সমস্ত মহলেই—জীব বা উদ্‌ভিদ—একের দিকে অন্যের বিসর্পিত অভিমুখিতা, অভিমুখী সেই টানটারই অন্য নাম ভালোবাসা। যে মনে করে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে প্রকৃতি থেকে সর্বস্ব থেকে, এমন-কী সে-ও প্রতিমুহূর্ত যুক্ত হয়ে আছে, থাকতে চায়, তার মুহূর্তের সঙ্গে, প্রবাহণের সঙ্গে। যোগ ছাড়া কিছু নেই।

আর সেই যোগেরই অন্য নাম ভালোবাসা। তেইয়ার ত্য শার্দ্যাঁর পরম ওমেগা হয়তো নেই কোথাও, কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি বিন্দুই যেন স্বতন্ত্র ওমেগা হয়ে ছড়িয়ে আছে বলে মনে হয়।

আ ঘা ত

স্বীকার করা উচিত যে খুদে পত্রিকাটির নিন্দেমন্দ পড়ে অল্পসময়ের জন্য বিবশ হলো মন। কিন্তু অল্পই, খুব বেশিক্ষণ নয়। কেউ কেউ, বা অনেকসময়ে অনেকেই, আঘাত যে করবেই সে তো নিছক সামাজিক নিয়ম। এর জন্যে নিজেকে তো তৈরি রাখতেই হবে?

আঘাত যে করে, নিজেকে সে খুব শক্তিমান ভাবে। আঘাত না করতে পারার শক্তিটাকে সে টের পায় না তত। আমিটাকে নিয়েই তো আমাদের সবচেয়ে বড়ো সংকট, আরেকজনকে আঘাত করতে পারলে, 'অপরের মুখ ম্লান করে' দিতে পারলে

সেই আমিটার হয়তো কিছু সাময়িক প্রতিষ্ঠা হয়। সে-রকম মানুষ যখন সব সময়েই থাকবে সমাজে, তখন ভাববার বিষয় হচ্ছে আহত মানুষ কী করবে।

এটা বলা খুব সহজ যে সে উপেক্ষা করবে এর সমস্তটাই। পাথরে পাথরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গ নিয়ে সে-রকম উপেক্ষা নিশ্চয় সম্ভব নয় সবার পক্ষে। সে কি প্রতি-আক্রমণ করবে তখন, প্রত্যাঘাত? যেখানে যুক্তির কোনো ভূমিকা আছে, সেখানে, সে-পর্যন্ত, সেটা সম্ভব। কিন্তু যুক্তিতর্কের বাইরে গিয়ে আঘাতটা যেখানে অভিসন্ধিময়, উশকানিমূলক এবং কলহপন্থী, সেখানে প্রতি-আক্রমণেরও কোনো মানে নেই। আলোড়িত হওয়া থেকে তো আমি নিবৃত্ত হতে পারি না, তবে সেই আলোড়নের মধ্যে থেকেও আমাকে বুঝতে হবে আমারই মধ্যে কোথাও ভুল ছিল কি না, কোনো ফাঁকি। যে আক্রমণ করছে, সে হয়তো অন্যায় ভঙ্গিতেই করছে, কিন্তু সে আমার কাছে এনে দিচ্ছে নিজেকে নিয়ে—নিজের শক্তি এবং প্রত্যাশাকে নিয়ে—পুনর্বিবেচনার একটা সম্ভাবনা। এইটুকুই লাভ।

এটা বলতে লজ্জা হয় যে কান্নার একটা আবেগ আসে কখনো কখনো। কোনো লাঞ্ছনায় নয়, কোনো বঞ্চনায় নয়, কোনো নীচতায় নয়, বরং একটা সৌন্দর্যের আঘাতে। ওপরে আকাশ, চারপাশে সবুজের ঘন বেষ্টন, দর্শকেরা ঘিরে আছে খোলা একটা অনুষ্ঠানভূমি, দীর্ঘ একটা পথ জুড়ে বসন্তী শাড়িজামায় প্রস্তুত ছেলে-মেয়ের দল, ধ্বনিত হলো গান, সারি বাঁধা নিশ্চলতা সজীব হয়ে উঠল মুহূর্তে, নাচের ছন্দে বিসর্পিত হয়ে এগিয়ে আসছে একটা বর্ণময় ঢেউ। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি এসে লাগে, হঠাৎ যেন দেখতে পাওয়া যায় গোটা এই হিল্লোলের পিছনে কোনো একজন মানুষের স্বপ্ন, তাঁর কল্পনা, সুন্দরের সঙ্গে নিবিড়তম একাত্মতা। হয়তো তখনই, সেই একই সঙ্গে ঘিরে ধরে আমাদের প্রতিদিনকার অপূর্ণতার আর তুচ্ছতার বোধ, হতে-চাওয়া আর হওয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধিটা দুস্তর হয়ে দুলতে থাকে চোখের সামনে। একজন সরাতে চেয়েছিলেন এই ব্যবধান, আমাদের সামনে তুলে আনতে চেয়েছিলেন জীবনের একটা ছন্দ,

এই বোধটাই অসতর্ক কোনো মুহূর্তে যেন আমাদের মধ্যে একটা তরল প্রবাহের সঞ্চার করে দেয়, ফেটে বেরোতে চায় কান্না। জানি, অল্প পরেই ভেঙে যাবে এই সুষমা, আর এই কান্নাটাও, কিন্তু এই-যে ছোট্ট একটা মুহূর্ত, একে কি নিছক অলীক ভাবতে পারি!

মুখচ্ছায়া

এই-যে মানুষটি এসেছিলেন, এর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আজ কেন মৃত্যুর মুখচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছি মনে হয়? কথা বলছেন উনি, আর আমি দেখতে পাচ্ছি ওঁর শব্দের শিথিলতা আর চোখের ক্লান্ত ক্ষরণের ভিতর থেকেও এমন একটা চাপা উজ্জ্বলতার বিচ্ছুরণ যা চারপাশে শেষ মুহূর্তের স্পর্শ নেবার জন্য নিদারুণ ব্যাকুলতায় বিছিয়ে যাচ্ছে জন থেকে জনে, মুখের রেখাগুলি কেবলই গড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে জলে ধ্বসে যাওয়া বালির মতো। সুন্দর হয়ে নয়, মৃত্যু যেন লোলুপ হয়ে ভেসে উঠছে এই এক মুখে, কষ বেয়ে গড়িয়ে নামে পিক, রসহীন শুকনো হাওয়ায় শব্দগুলি

খুবলে খুবলে চলে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে দূরে, মাথার পিছনে এক অর্ধ চাঁদ-চালচিত্রে আঁকা যেন যম-দণ্ড আর কালো খেয়া, বোঝা যায়, দেখা যায় না কিছু।

ম ধ্য রা ত

না-এর পর না দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখতে রাখতে কোন্ শীর্ণতায় এর পরিণাম, বর্জনে বর্জনে বর্জনে কোন্ এককত্বে সর্বনাশ, কেন্দ্রের কোন্ মানে আর থাকবে যদি পরিধি যায় বিচ্যুত হয়ে, স্পর্শ যদি না থাকে কোনো স্পর্শক তবে কাজ করবে কোথায়। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে স্তবকে স্তবকে উঠে-আসা নিঃশব্দ গানে ভিজে যায় ঘাস, ভিজে যায় অবোধ প্রাণীদল, ঘূর্ণিত হতে থাকে সময়, গ্রহণে গ্রহণে গ্রহণে ভরে যায় অঞ্জলি, করপুট উঠে যায় আলোড়িত আকাশের দিকে। না-এর মধ্য দিয়ে ঝলকে ঝলকে এগিয়ে আসে অস্তি, অশ্বত্থের গুঁড়ি ছুঁয়ে মধ্যরাত বলে : স্তব্ধ হও, শোনো। শুনি। অবিরল উতরোল অনাবিল পদধ্বনি শুনি সারারাত।

অল্প কয়েক বছর আগে, সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রসঙ্গে বলেছিলেন গোপাল হালদার 'তাঁর কমিটমেণ্ট ছিল। তবে তা ছোটো কমিটমেণ্ট নয়, বড়ো কমিট-মেণ্ট, মানুষের কাছে জীবনের কাছে এবং শিল্পের কাছে সতীনাথের সেই কমিটমেণ্ট। অথবা সেই কমিট-মেণ্ট সত্তার কাছে, ছোটো আমি ছাড়িয়ে বড়ো আমির কাছে।'

এই শেষ কথাটিতে পৌঁছে সবারই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের নাম। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে এও আমাদের মনে পড়বার কথা যে গোপাল হালদার তাঁর বিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাসেও বারে বারে ঘুরিয়ে আনেন এই কথা, তাঁর নায়ক অমিত কমিউনিজমের দীক্ষায় এসে পৌঁছতে পারে কেবল এইজন্যে যে সে-পথ মানবমুক্তির দিকে, ভালোবাসার রাজ্যে, সে হলো—তাঁর ভাষায়—'নানা মানুষের বড়ো আমির তপস্যা'।

তপস্যার মতো কোনো কোনো শব্দ এখনকার পাঠকদের কাছে ভারি ঠেকতে পারে হয়তো, আর সেই কারণে একে মনে হতে পারে কিছু-বা সাজানো

কথা। কিন্তু যখনই কোনো কাজের দায়ে এসে পৌঁছই আমরা, তখনই বুঝতে পারি যে নিজেকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নেওয়াই হলো আমাদের প্রধান এক সমস্যা, কেননা সকলের সঙ্গে মিলবার পথে আমাদের অহংই হয়ে দাঁড়ায় বড়ো বাধা। আত্মসচেতন মানুষ বুঝতে চায় সেই বাধার পরিমাণ, অতিক্রম করতে চায় তাকে, তার আত্মপরিচয় ক্রমে বিস্তারিত হয়ে দেখা দিতে থাকে তার দেশের পরিচয়ের মধ্যে, তার কালের পরিচয়ের মধ্যে। নিজের খোলস ভেঙে মানুষের এই আত্মসচেতন বিস্তারের ইচ্ছে, বিশ্বের সঙ্গে আমির এই সংযোগ, আধুনিকতার এই হলো এক বড়ো লক্ষণ।

তাই আজ যখন আবার নতুন করে পড়ি কারাবাসের মধ্যে বিপ্লবী অমিতের এই বর্ণনা 'অমিতের আত্মপরিহাস ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়াছে : কাহাকে অমিত, ফাঁকি দিয়াছ তুমি? নিজেকে, শুধু নিজেকেই দিয়াছ। আর তাহাতেই জানো—নিজেকে মানুষ ফাঁকি দিতে পারে না। সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে এইবার মুখোমুখি হইতে হইবে তোমাকে···অমিত। জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি করিতে পারিবে কি আজ?'

নিজের সঙ্গে মুখোমুখি আর জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি যখন একই রেখায় এসে দাঁড়ায়, যখন অমিত ভাবে যে সে আজ 'আত্মস্থ অর্থাৎ একাত্ম, আর তাই 'বিশ্বাত্ম', তখন তার মধ্য দিয়ে আমরা কেবল এদেশের বিপ্লবী ইতিহাসের বা কমিউনিজমের ইতিহাসের টুকরো একটি পর্বকেই মাত্র দেখি না, তার মধ্যে আমাদের এই চলতি সময়ও জেগে ওঠে যেন। যে-লাইনটি বারে বারে উচ্চারণ করে অমিত, তার কিছুটা স্বাদ আমরা খুঁজতে থাকি আমাদের বর্তমান মুহূর্তের মধ্যে : only in intense living do we touch infinity।

তিনটি দিনের উপর ভর করা তাঁর এই তিন খণ্ড উপন্যাসের সাম্প্রতিক সংস্করণে প্রশ্ন করেছেন লেখক : 'সেই তিন দিন কি অতীত ? তিন দিনের মধ্য দিয়ে শেষ অবধি এখনো কি শুনতে পাই না অয়মহং ভো ?'

আমাদের মনে পড়বে, এই উচ্চারণেই শেষ হয়েছিল ত্রয়ীর শেষ খণ্ডটি, স্বাধীন দেশের জেলগাড়িতে উঠবার সময়ে যে-কথা ভাবছিল অমিত : 'এক-একটি দিনের মধ্যে — প্রতিটি সাধারণ দিনের মধ্যেও — ইতি-

হাসের সেই আর এক দিন রূপায়িত, বিঘোষিত তাহার মহদাশ্বাস : অয়মহং ভো ।'

তখন বুঝতে পারি, একটি দিনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি উপন্যাসকে গড়ে তুলবার এই পদ্ধতি নিছক কোনো প্রকরণের বৈশিষ্ট্য হয়েই আসে না গোপাল হালদারের লেখায়, তা আসে আরো বড়ো তাৎপর্য নিয়ে। ব্রিটিশ সরকারের রাজত্বে কারাবাসের দিন-গুলিতে, বক্সায়, বাংলার আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে যা-কিছু ভাবছিলেন এই লেখক, তার থেকে ধরা যায় যে প্রুস্ত বা জয়েসদের মতো লেখকদের প্রতি তাঁর অনুরাগ তত প্রবল নয়, আধুনিকদের একাংশকে বরং তিনি আক্রমণই করতে চান এই বলে যে 'আপনারা এখন পেয়েছেন প্রুস্ত ও জয়েসের অদ্ভুত প্রতিভার সংবাদ, অলডাস হাক্সলির চমকলাগানো বিদ্যাবুদ্ধি বৈদগ্ধ্যের সাক্ষাৎকার।' কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন কেউ, তাঁর নিজের উপন্যাসের রীতিতেও কি তিনি আনেননি জয়েসের প্রুস্তের প্রবর্তিত ধরন? প্রশ্নটিকে একটু ভেবে দেখা যায়।

'এই কি শুধু জীবন?' অমিতের এই প্রশ্নটি

শুনে মনে পড়তে পারে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের অনুরূপ প্রশ্ন : Is this life ? অথবা, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক-একটি দিনের আয়তনে যেভাবে আমরা অমিতের গোটা উপন্যাসটিকে পেয়ে যাই, তাতে নিশ্চয় মনে পড়বে জয়েসের 'ইউলিসিস', সেই একই সকাল থেকে রাতের বৃত্তান্ত। অল্প সময়খণ্ডের মধ্য দিয়ে বহু সময়কে পরিক্রমা করে আসা, ভাবনার নানা প্রবাহের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার স্তরের পর স্তর উন্মোচন করে আনা : এসব নিশ্চয় জয়েস থেকেই তাঁর পাওয়া। তাহলে কি মিথ্যে ছিল তাঁর এই সতর্কীকরণ যে এসব ধরন 'শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিগত — একার জিনিস — যেমন জয়েসের শেষ দিককার লেখা, স্টাইনের ধ্বনিপ্রাণ কবিতা। তাতে আঙ্গিক বড়ো হয়ে ওঠে। ···সাহিত্যের কৌশলও তেমনি কৌশল থাকে, যথার্থ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে না।'

তবে কেন গোপাল হালদারকেও ব্যবহার করতে হলো ওই 'কৌশল' ? ১৯৩০ সালের একটি দিন-রাতের শেষে পুলিশের 'সবুট পদধ্বনি' এসে থামছে অমিতের দুয়োরের সামনে, ১৯৩৭-এর অন্য এক দিনে

মুক্তি হচ্ছে তার, স্বাধীন ভারতের আর এক দিনে নতুন করে আবার জেলে পৌঁছয় সে : কেন মাত্র এই তিনটি দিনের আয়তনে তিনি ধরতে চান গোটা একটা দেশের উন্মেষের ইতিহাস ? একজনের ভাবনার মধ্য দিয়ে এই দেখার, এক-একটা দিনের খণ্ডতার মধ্য দিয়ে এই দেখার, একটা সীমাবদ্ধতা কি নেই ?

কিন্তু এইখানে আমাদের বুঝতে হয়, উল্‌ফের প্রশ্ন আর অমিতের প্রশ্নে উচ্চারণগত সমতা থাকলেও মূলত তা ভিন্ন, জয়েসের রীতি আর গোপাল হালদারের রীতির সদৃশতাও আপাতদৃষ্ট মাত্র। এঁদের থেকে দূরে সরবার পদ্ধতিতেই গোপাল হালদার এড়িয়ে যেতে চান এ-রীতির সীমাবদ্ধতা। ১৯০৪ সালের ১৬ জুন, সেই একটি দিনের মধ্য দিয়ে গোটা এক শহরের জীবনকে তুলে আনছিল জয়েসের নায়ক, কিন্তু সেখানে সময়ের চলা ছিল উলটো মুখে। স্টিফেন ডেডলাস ভাবছিল সেখানে : Hold to the now, and here, through which all future plunges to the past। গোপাল হালদারের উপন্যাসেও অবলম্বন এই 'এখন' আর 'এখানে', কিন্তু তাঁর রচনায়

ভবিষ্যৎ অতীতের দিকে ঝাঁপিয়ে যায় না, অতীত ঝাঁপ দিয়ে চলতে চায় ভবিষ্যতের দিকে। বর্তমান সেইজন্যেই তাঁর কাছে এত বড়ো। সে তো বিচ্ছিন্ন নয়, অতীত থেকেও নয়, ভবিষ্যৎ থেকেও নয় ; নূতন আশ্বাস আর নূতন সম্ভাবনার — হ্যাঁ, নূতন বাধারও — মধ্য দিয়ে প্রতি-দিন এগিয়ে চলেছে ভাবী কোনো মানবিকতার দিকে, এরই রাজনৈতিক ইতিহাস আমরা তখন দেখতে পাই তাঁর উপন্যাসে। প্রুস্ত তাঁর রচনায় চেয়েছিলেন সময়ের এক শুদ্ধ সত্তাকে খুঁজে নিতে। সেই শুদ্ধ সময়ের এক টুকরোকে, তার স্থির রূপকে বিচ্ছিন্ন করে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। অন্যপক্ষে, অমিত বা অমিতের লেখকের সামনে আছে 'দিনের পর দিন, দিনের পর দিন — জীবনের মালা পূর্ণ হইয়া আসে। জীবনের পর জীবন — কালের হাতের অক্ষমালা সরিয়া সরিয়া পর্বান্তে ঘুরিয়া আসে। বিপ্লবের পর আবার বোধন, আবার নূতন কালের নূতন বিরোধ, নূতন সমন্বয়। দিনের পর দিন — যুগের পর যুগ।'

এই ভাবনার মধ্যে অমিতের সেই একদিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় আমাদের সদ্যতন এই দিন। তখন, কেবল

নিজের কাছে নয়, এ-দিনেরও পাঠকের কাছে গিয়ে পৌঁছয় অমিতের এই পরামর্শ : 'চলো চলো, এই তো তোমারও পথ, ইতিহাসের পথ, জীবনের পথ, মানব-তীর্থের পথ।' গোপাল হালদারের তিনদিনের উপন্যাস, তাঁর 'ত্রিদিবা', এই পথেরই এক উদ্দীপক ছবি।

জীবনানন্দ : উত্তরাধিকার

আমাদের এই সময়ের প্রধান একজন কবি, বিনয় মজুমদার, তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন একবার :

> ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে
> কতিপয় চিল শুধু বলেছিল 'এই জন্মদিন'।
> এবং গণনাতীত পারাবত মেঘের স্বরূপ
> দর্শনে বিফল বলে, ভেবেছিল, অক্ষমের গান।
> সংশয়ে সন্দেহে দুলে একই রূপ বিভিন্ন আলোকে
> দেখে দেখে জিজ্ঞাসায় জীর্ণ হয়ে তুমি অবশেষে
> একদিন সচেতন হরীতকী ফলের মতন
> ঝরে গেলে অকস্মাৎ, রক্তাপ্লুত ট্রাম থেমে গেল।

পঁচিশ বছর আগে একদিন থেমে গিয়েছিল এই 'রক্তাপ্লুত ট্রাম'। যে-কবির একদিন মনে হতো যে 'এই দেহের ব্যাঘাতে / হৃদয়ে বেদনা জমে', সরে গেল সেদিন তাঁর সেই ব্যাঘাত। যিনি চেয়েছিলেন 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে' যেতে, তাঁর সেই ইচ্ছে যেন চরিতার্থ হলো সেদিন।

কিন্তু কবির সত্তায় মিশে যাওয়া এই অন্ধকার নিয়ে জীবনানন্দের মৃত্যুদিনই হয়ে ওঠে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম-

দিন। কেননা তাঁর মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর জুড়ে বাংলা কবিতার দিকে তাকালে দেখতে পাই, কী-ভাবে এক অপ্রখর অথচ অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তিনি জেগে ওঠেন আমাদের পটভূমিতে। 'কতিপয় চিল শুধু বলেছিল, এই জন্মদিন' বিনয়ের এই আক্ষেপ আজ দূর হবার কথা। বিনয় আর তাঁর সহযাত্রী কবিরা জীবনানন্দকে কেবলই আবিষ্কার করে নেন তাঁদের নিজের নিজের ধরনে, নিজের নিজের গরজে। 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি, তুমি অন্ধকারে' হয়ে উঠতে পারে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাবইয়ের নাম, 'অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন' মহীনের ঘোড়া-গুলিও নেমে আসতে পারে তাঁর কবিতায়, জীবনানন্দ থেকে। কিংবা তাঁর 'কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিল আমায় পুরোনো চাঁদ' বা 'সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি' এই ধরনের লাইনগুলি, তার শব্দে আর ছন্দস্পন্দে, পাঠককে মনে করিয়ে দিতে পারে জীবনানন্দ, বিশেষত তাঁর 'হাওয়ার রাত', যেখানে আমরা শুনেছি

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত,
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমি সমুদ্রের পেটের মতো

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নয়, আধুনিক পাঠক তাঁর জীবন খুঁজে পান জীবনানন্দেরই রচনায়—'কবিতা' পত্রিকার শেষ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ তুলনা দিয়ে এ-কথা বলতে শুরু করলেন নিরুপম চট্টোপাধ্যায় বা জ্যোতির্ময় দত্তের মতো সেদিনকার তরুণেরা। 'চিনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস' বা 'হাইড্রাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল' বা 'একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে' : এ-ধরনের ছোটো এক-একটি উচ্চারণ কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক দীর্ঘ বর্ণনার তুলনায় অনেক সহজে তুলে আনে শহরের আত্মা, এঁরা তা দেখালেন সেদিন। এই অনায়াস সংহতি যে জীবনানন্দের কবিতার এক বড়ো আকর্ষণ, পরবর্তী অনেক কবির আলোচনাতেও দেখি সেই ইঙ্গিত। 'কবিতা-পরিচয়' নামের স্বল্পজীবী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে পর পর কথা বলছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিনয় মজুমদার বা আলোক সরকারের মতো কবিরা।

বিনয় সে-আলোচনায় আমাদের মনে করিয়ে দেন যে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটা বড়ো সূত্রই হলো এলিমিনেশন—বর্জন—যার ফলে কবিতার রহস্যময়তা বাড়ে, পাঠকও হয়ে ওঠেন সৃষ্টিশীল। 'ঘোড়া' কবিতাটির কথা বলতে গিয়ে আলোক লেখেন: 'বক্তব্যকে ঘোষণার মতো করে বলবার প্রয়োজন নেই, আমাদের কেবল কয়েকটি ছবির মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে, এবং যেমন কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের সামনে আলোকিত উন্মোচন ঘটায়, ঠিক সেই রকমই কবিতাটি তার সকল সত্য নিয়ে আমাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসিত হয়েছে।' এর সঙ্গে যদি জুড়ে নিই 'কৃত্তিবাস'-এর কবিদের বিষয়ে অলোকরঞ্জনের এই মন্তব্য যে এঁরা চেয়েছিলেন এক 'মহতী অনিশ্চিতি'কে তুলে আনতে তাঁদের কবিতায়, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, কেন অন্য অগ্রজদের তুলনায় জীবনানন্দ অনেক বেশি টেনে নিয়েছিলেন এই তরুণদের।

প্রথম আবির্ভাবের সময়ে, স্বভাবতই, জীবনানন্দের এই পরিচয় স্পষ্ট ছিল না পাঠকের কাছে। 'অক্ষমের গান' বলে একে উপেক্ষা করা সহজ ছিল সেদিন, প্রত্যা-

শিত ছিল 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপ। এটা ঠিক যে সেই অস্পষ্ট মুহূর্তেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতাকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছিলেন পাঠকের সামনে, তাঁর আস্বাদন দিয়ে। এজন্য আজ কৃতজ্ঞ বোধ করি আমরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে বুদ্ধদেবও সেদিন পৌঁছননি জীবনানন্দের কবিতার অন্তঃসারের দিকে। আপাতশিথিল ছন্দ দিয়ে কীভাবে তিনি তৈরি করেন 'সূক্ষ্ম সংগীতের জাল', নটকান থুতনি বা শেমিজের মতো আটপৌরে শব্দাবলিতে কীভাবে এনে দেন এক তাজা স্বাদ, আর ছবি তৈরি করার অজস্রতায় কীভাবে তিনি আবিষ্ট করে ধরেন আমাদের, এইটেই দেখান বুদ্ধদেব। অথবা হয়তো বলেন : জীবনানন্দ নির্জনতার, প্রকৃতির, নস্টালজিয়ার কবি। তাঁর কবিতায় বুদ্ধদেব দেখেন 'স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পণের আকূতি।'

এর সবই সত্যি, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমরা ছুঁতে পারি না জীবনানন্দের কবিতার সেই পরিচয়, যাকে তিনি নিজে বলেছিলেন 'সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্ক'। কবিতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ বারে বারেই

কেন ঘুরিয়ে আনেন আভা অন্তঃসার বা প্রতিভার মতো শব্দাবলি, কেন তিনি বলেন ভাবনাপ্রতিভা ভাব-প্রতিভা বা কল্পনাপ্রতিভার মতো সমস্তপদ, তা স্পষ্ট হয় না বুদ্ধদেবের আস্বাদন থেকে। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়েও নতুন এক জলের কল্পনা করতে চেয়েছিলেন এই কবি, সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে দেখে-ছিলেন এক নতুন দীপ। এইভাবে তিনি দেখেন জল নয়, তার জলত্ব। দীপ নয়, তার দীপতা। অর্থাৎ, বস্তু নয়, এক বস্তুসংগতি। এইখান থেকেই তাঁর কবিতার শুরু।

কিন্তু তার মানে কি তবে এই যে বস্তুপৃথিবী থেকে কেবলই আমাদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন এই কবি? বক্তব্যের, ভাবের, ঘোষণা করে বলবার জগৎটা সরে যাচ্ছে বলে নতুন কবিদের আগ্রহ তাঁর প্রতি। কিন্তু সে-আগ্রহ কি বস্তুজগৎ থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে আমাদের? জীবনানন্দের কবিতা কি শেষ পর্যন্ত সেই বিচ্ছিন্নতার কথাই বলে?

জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, এ নয় কেবল অধো-জাগতিক চেতনার পথ; কেবল অবক্ষয়জাত ক্লান্তির

মধ্যেই আহ্বান করে না জীবনানন্দের কবিতা। এই কবি বুঝেছিলেন 'সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ আজকের সাথে মিশে গিয়ে বর্তমানকে স্পষ্টতর ভাবে গঠন করে।' নিজেকে তাই অল্প একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেন বহু দেশ আর বহু কালের সুড়ঙ্গপথে ধরতে চান তিনি আমাদের সমসাময়িক পৃথিবী, কেননা ঠিক ওই দূরত্বের মধ্যেই

আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাব স্পর্শে আরো ঋত— অন্তর্দীপ্ত হয়।

আধুনিক কবিতার প্রথম পর্বে যখন প্রখর হয়ে উঠেছিল জ্ঞান আর বুদ্ধির চর্চা, জীবনানন্দ তখন আমাদের নিয়ে যান ইন্দ্রিয়ময় সমস্ত শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার এক তীব্র জটিল বাস্তব অভিজ্ঞতায়। আর এরই জন্য, শৈলেশ্বর ঘোষের মতো প্রতিবাদী ক্ষুধার্ত কবিরাও একমাত্র জীবনানন্দেরই মধ্যে—তাঁর নিষ্ঠুর আত্ম-আবিষ্কারের মধ্যে—খুঁজে পান সমমর্মিতা। অবশ্য জীবনানন্দের কবিতাও জানে যে 'জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই', কিন্তু সে-জ্ঞান কোন্ জ্ঞান? 'আমাদের এই জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু; / তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে জ্ঞান নেই।' জ্ঞান আর প্রাণের

এই সামঞ্জস্য করতে চান জীবনানন্দ। মানুষের ভাষা যে তার অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পেলে 'নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল' ভাষাকে সেই কঙ্কাল থেকে উদ্ধার করেন বলেই তিনি তাঁর পরবর্তী কবিদের কাছে এত অমোঘ, এত প্রিয়। এটা হয়তো ঠিক যে জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতা আর রহস্যময়তা যতটা বেশি দৃষ্টি পায় সাম্প্রতিক কবিতায়, ততটা লক্ষ্যে আসে না তাঁর ইতিহাসের বা পরিপার্শ্বের বোধ কিংবা তাঁর এই ভবিষ্যধারণা যে 'শ্লেষও মহান কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি—আসছে দশপনেরো বছরে আমাদের দেশে আধুনিক কবিতা এসব পরিণতির দিকে মোড় ঘোরাবে কিনা ভাবছি।' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি যে একদিন 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, নরকের দাহ নিয়ে ক্রমে উঠে এসেছিলেন তাঁর দেবদারুর জগতে, সেই ইতিহাস আর বিবর্তন হয়তো আজও আমাদের ব্যবহারে আসেনি ততটা, 'আমাদের এই শতকের / বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু', কিন্তু তবু আমরা তাঁরই ভাষায় ভরসা করে থাকি এই ভেবে যে

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

'গ্রাম ও শহরের গল্প' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন জীবনানন্দ। সে-গল্পে শহরে বসে দুটি নারীপুরুষের কথা চলছিল এইরকম :

শচী অনেকক্ষণ পরে বললে, 'চলো না, পাড়াগাঁয় যাই—'

'কোন্ পাড়াগাঁয় ?'

'যেখানে ছিলাম আমরা—'

'সেই বকমোহানার নদীর ধারে ? ভাঁটশ্যাওড়া ময়নাকাঁটার জঙ্গলে ?'

শচী মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ—সেখানেও—'

সোমেন বললে, 'অসম্ভব।'

কথাগুলি শুনতে শুনতে কারো মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। একটু ভিন্ন পরিবেশে, দুটি চরিত্রের প্রায় অনুরূপ কথা শুনেছি আমরা চন্দ্রা আর বিশুর এই সংলাপে :

'এসো না বেয়াই, পালাই আমরা।'

'সেই নীল চাঁদোয়ার নিচে ? খোলা মদের আড্ডায় ? রাস্তা বন্ধ।'

কিন্তু রাস্তা বন্ধ বলে থেমে যায়নি বিশু। যক্ষপুরীর

গলিত পরিবেশের মধ্যে জীবনের একটা পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করে সে, তার শ্রমিকতায়, তার সামাজিক দায়ে। জীবনানন্দের সোমেনরা প্রায়ই তা পারে না। আর পারে না বলেই নিজেকে এবং অন্যকে কেবলই জর্জরিত করে আঘাতে আঘাতে।

'গ্রাম ও শহরের গল্প' জীবনানন্দের একটি গল্পের নাম। কিন্তু বলা যায়, তাঁর সব গদ্যরচনাই, 'ছায়ানট' বা 'বিলাস', 'মাল্যবান' বা 'সুতীর্থ' এই সবেরই ভিতর-কার সংঘর্ষ তৈরি করছে গ্রামশহরের বিরোধ। সবকটির জন্যই নির্ধারিত হতে পারত ওই একই নাম : গ্রাম ও শহরের গল্প। তাঁর গদ্যের প্রায় সর্বত্রই জীবনানন্দ দেখান সেই মানুষের ছবি, প্রকৃতির থেকে ছিন্ন হয়ে যে মানুষ যন্ত্রসভ্যতার এক যক্ষপুরীতে এসে দাঁড়িয়েছে, যে মানুষ তার পরিবেশ থেকে কেবলই বিযুক্ত দেখে নিজেকে। যে যোগ তার হতে পারত, আর যে বি-যোগের মধ্যে সে আছে, জীবনানন্দের নায়কেরা কেবলই তার ভিন্ন দুই রণন জাগিয়ে তোলে তাদের ভাবনায় ব্যবহৃত প্রতিমায়।

লেখক যখন বলেন, 'মাল্যবানের অবকল্পনা আছে,

অবপ্রতিভাও। চেতনার একটি সূর্যের বদলে অবচেতনার অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে সে', তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এ কেবল মাল্যবানেরই কথা নয়, তার স্রষ্টারও কথা, বহুল প্রতিমায় পুঞ্জ হয়ে উঠছে যাঁর অন্তহীন নক্ষত্র। অবকল্পনা আর অবচেতনায় জীবনানন্দ যখন দেখেন যে 'আমাদের এই মেট্রোপলিসে, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে, সফলতাও, সরলতাও', তখন আজকের পৃথিবী তাঁর কাছে দেখা দেয় কোনো এক 'ভোজালি' বা 'চেঙ্গিস খাঁ'র প্রতীকে, কখনো-বা পশুপতঙ্গের এক দমচাপা মিছিলে। তাঁর ছোটো একটি অমোঘ কবিতায় আমরা পড়েছি একদিন :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি

এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য ও রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

জীবনানন্দের গদ্য যেন এই কবিতারই বিস্তার। তাঁর গদ্যপ্রতিমাতেও কেবলই তাই পাব শকুন আর শেয়াল-দের এক অন্ধকার জগৎ।

শুধু শকুন শেয়ালই নয় অবশ্য, তার চেয়ে একটু বেশি প্রসারিত এর সীমানা। বোর্ডিং-এর জীবন-যাপনে মাংসলোলুপ বাসিন্দাদের হিংস্রতা দেখে মাল্য-বানের মনে হয়েছিল, 'এ তো স্বাভাবিক। শেয়াল বেড়াল চিতেবাঘ কেঁদোবাঘের মতো মানুষ হিংসাত্মক তো।' সেই স্বাভাবিকতায় মাল্যবান তার পরিজন-দের মুখে দেখে 'কচ্ছপের চামড়ার মতো কঠিন একটা ভাব', দেখে 'মাকড়ের ঠ্যাং, ফিঙের ঠ্যাং, কাতলের মুখ, ভেটকির মুখ'। দেখে 'মাকড়শার জালের মতো জড়িত চোখ', তার স্ত্রীর স্বভাবে সে দেখে 'কত যে সজারুর ধাষ্টামো কাকাতুয়ার নষ্টামি ভোঁদরের কাতরতা বেড়ালের ভেঙচি কেউটের ছোবল আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির'।

কেবল মাল্যবানই নয়, সুতীর্থও আসে এমনি সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সেখানেও ঘুরে ঘুরে আসে ছিপছিপে বানরের বাচ্চা গোখরো সাপ আরশোলার শুঁড় হরতেল ঘুঘু বা পাঁকাল গজাল। আর তারই মধ্যে দেখা দিতে থাকে শেয়াল বেড়াল হায়েনার রগড়ে গর্জন করে উঠবার সাধ। ফলে, 'মাল্যবান' উপন্যাসে স্ত্রী আর শিশুকন্যাকে নিয়ে নায়ক যখন ঘুরে বেড়ায় চিড়িয়াখানায়, আর তাই নিয়েই চলে গোটা একটা পরিচ্ছেদ, তখন তা নিছক ঘটনাপ্রবাহ হয়ে থাকে না আর, হয়ে ওঠে প্রতিমাপ্রবাহ। সেখানে পশুপাখি দেখবার প্রতিটি মুহূর্তই গড়িয়ে যায় এক দ্বিস্তর অভিজ্ঞতার দিকে। মনু নামে ছোটো মেয়েটির বাঘসিংহ দেখবার আগ্রহে কান দেয় না তার মা-বাবা। কেননা 'সুতীর্থ' উপন্যাসে তো শুনবই আমরা 'স্টক এক্সচেঞ্জের চিৎকারে যা আছে তা বাঘের গর্জন সিংহের গর্জনও নয়, যেন শেয়াল হায়েনার হুল্লোড়।' তাই 'মাল্যবান'-এ মেয়েটিকে এড়িয়ে গিয়ে মা উৎপলা দেখতে চায়, 'আরশোলা যে-রকম কাঁচপোকা হয়, তেমনি শামকল হয়ে যাচ্ছে

ধনেশটা।' তারপর একসময়ে, এই চিড়িয়াখানারই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে তারা। তখন মাল্যবান দেখে উৎপলাকে। দেখে 'একটা হাত তার বুকে আর একটা কোলের ওপর ভাঁটার টানে সমুদ্র সরে গেলে ভিজে ঝিনুক পরগাছা ঠাণ্ডার মতো করুণ হয়ে পড়ে আছে।'

এইখানে হঠাৎ একমুহূর্তের জন্য স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে আর উপমান হয়ে রইল না 'ভাঙা গেলাসের কাঁচ'। এইখানে হঠাৎ দেখা দিল করুণা। দেখা দিল, কী হতে পারত সেই সম্পর্কের গাঢ় এক বিন্যাস। এই বিন্যাস থেকে জীবনানন্দের কাহিনীতে উঠে আসে বিপরীত এক প্রতিমাবলয়, যেখানে বিস্তার নিয়ে জেগে থাকে উদ্ভিদজগৎ, থাকে নক্ষত্রমণ্ডল। তখন এর চরিত্রগুলি শোনে 'সেসব অভিজিৎ চিত্রা সপ্তর্ষির ভাষা'। সেখানে সমস্ত বেদনা 'বনঝাউয়ের মতো শিশিরে পাতায় কেঁপে উঠে অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে উঠে যায়।' দেখা যায় সেখানে 'অন্তহীন কাটাকুটি মেঘডুমুরের পাত সর্ষের ঝাঁঝ'। মানুষ সেখানে 'শিলং টিলংএর পাইনগাছদের মতো উঁচু'। আর তার চরিত্রে

'শীতের দেশের দেবদারুর মাংসের মতন দৃঢ়তা'। তার হাসি সেখানে 'সমুদ্রপারের ঘনবুনোনো ফরসা শঙ্খের মতো নিটোল'।

এসব ছবি অবশ্য 'সুতীর্থ' থেকে নেওয়া। কিন্তু কেবল 'সুতীর্থ'ই নয়। নিরাশা-ধিক্কারে ভারাতুর মাল্যবানেরও ওই একই স্বপ্ন। তারও বিষয়ে কখনো শুনব আমরা, 'প্রকৃতির দিঙ্‌নির্ণয়ী মন নড়ে ওঠে যেন'। এই মন নিয়ে, প্রকৃতির এই নির্ণয় নিয়ে মাল্যবান খোঁজে তার মুক্তি, 'নীলিমায় নীলিমায় সূর্যে রৌদ্রে আকাশপথের পাখির পালকে'।

সমস্যাটা তাহলে কেবল গ্রাম শহরের দ্বন্দ্বে নয়। এ-দ্বন্দ্ব আছে মন আর শরীরের ছিন্নতায়। মাল্যবান বুঝেছিল একদিন, 'নিজের মনটা তার স্বাতীর শিশির হলেও শরীরটা তার শুক্তি নয়। কিন্তু শামুক গুগলীর মতো ক্লেদাক্ত জিনিস।'

আধুনিক সভ্যতার এই শারীরিক ক্লেদ ঘনদৃষ্টিতে জেনেছিলেন জীবনানন্দ। কবিতায় সেটা ধরা দেয় প্রধানত এক ধূসর পটে, আত্মবিলীনতায়। আর গদ্যে সে ধ্বংসের ছবি আসে এক আক্রমণময় রক্তিম

ভাষায়। কিন্তু কবিতায় বা গদ্যে, এর থেকে মুক্তির কি কোনো ইশারাই নেই তাঁর রচনায়? আমাদের মুক্তি কি কেবল অতীতবিলাসে? কোনো ভবিষ্যৎ নেই তার? ত্রাণের জন্য আমাদের কি ভাবতে হবে কেবল সুতীর্থের মতো, 'ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মন্দিরে একা বসে আছি খুব রাতে। আমাকে ঘিরে দেব-দাসীর নাচ' কিংবা মাল্যবান যেমন ভাবে, 'মানুষ না হয়ে সে যদি সারস হতো'? মনে হয় না তা।

জীবনানন্দের কবিতার পাঠক জানেন, পরিণতির দিকে পৌঁছে এই কবি বলতে পেরেছিলেন যে, যদিও 'এ যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো / চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের', কিন্তু তবুও মানুষ আজ 'দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে / অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের' দিকে চলেছে কেবলই। ১৯৪৬-৪৭-এর উদ্‌বেল দিনগুলিতে পৌঁছে মনে হবে তাঁর—

রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—

আর অন্যদিকে

গগন বিপিন শশী পাথুরেঘাটার ;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এণ্টালির –'
কোথাকার কে বা জানে ;

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়বে যে 'সুতীর্থ' উপন্যাসও তার মধ্যপর্বে এসে পৌঁছবে নিচের তলার এই মানুষদেরই মধ্যে। সেইখানেই সুতীর্থের মুক্তি। আক্ষরিকভাবে যেন কবিতারই ওই কথাগুলি শুনি আমরা, যখন সুতীর্থ গিয়ে বসে একেবারে 'অনন্ত আর গোলাম মহম্মদের গা ঘেঁষে আর বলে—হামিদ ইয়াসিন মকবুল বিপিন, শোনো তোমরা—'। শুরু হয় তাদের রাজনৈতিক বিবেচনা।

মৃত্যুর অনেক পরে ছাপা হয়েছে বলে জীবনানন্দের এই গদ্যরচনার কালবিষয়ে খুব নিশ্চিত হতে পারি না আমরা। কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হয়তো ধরিয়ে দেয় যে 'মাল্যবান'-এর উত্তরণ আছে 'সুতীর্থ'র মধ্যে। মাল্যবান ভাবত, 'সে কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর? না মধ্যম মধ্যশ্রেণীর? খুব সম্ভব নিম্নমধ্যবিভাগের লোক সে। কিন্তু সমস্যাটা সমস্ত মধ্যশ্রেণীতেই দুর্বিষহভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।'

এই দুর্বিষহতায় ডস্টয়েভ্স্কি বা কাফ্কার উপন্যাসের কীটপতঙ্গের মতো জুগুপ্সাময় হয়ে থাকে মাল্যবানের পৃথিবী। কিন্তু 'সুতীর্থ' উপন্যাসের কর্মভূমি যখন এসে দেখা দেয় ধর্মঘটের শ্রমিকদের কাছে, সামাজিক দায়ে, ঠিক তখন থেকেই আস্তে আস্তে দূরে সরে যায় হাঙর আর কাঁকড়া বা সাপবেজীর দল। শহরের মধ্যে তখন যুক্ত হতে থাকে গ্রাম, অনেকটা মিলিয়ে আসে শরীর-মনের দ্বন্দ্ব। তখন থেকে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে সুতীর্থের চোখে দেখা এইসব ছবি 'যারা আগুন বাঁচিয়ে রেখেছে, যারা আগুন, যারা আগুন নয়, বিকেলের নদীর মতো স্নিগ্ধ, যারা আগুন নিবিয়ে ফেলে নক্ষত্রের রাত্রির মতো দিনাত্মা, মানবসত্তার সেইসব আত্মার মতো সূর্য ঐ'।

অধিচেতনের এই ছবিটিতে পৌঁছে দেবেন বলেই জীবনানন্দের গদ্যপ্রতিমায় পশুবলয়ের নিষ্ঠুরতা শেষ পর্যন্ত আমরা সইতে পারি। পরিবেশের গ্লানিকে সম্পূর্ণ চিনিয়ে দিয়ে তার থেকে আমাদের উত্তীর্ণ করে নিতে চান তিনি।

স্বস্তিহীন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে গ্রেগর সামসার ঘুম ভেঙে যায় এক সকালে, আর সে দেখে সে হয়ে গেছে মস্ত একটা কীট। ঘুম তার ভেঙেছিল সত্যি? না কি ওটা তার স্বপ্নেরই কোনো প্রসার? জোসেফ কে.-ও সকালবেলায় শুয়ে ছিল তার বিছানায়, যখন তাকে শুনতে হলো তার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। জেগে ছিল সে? না কি এও এক ঘুম? আরেকজন কে. সন্ধেবেলায় পৌঁছল কোন্ গাঁয়ে, আশ্রয় খুঁজে নিল এক সরাইখানায়, ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে, আর অল্প পরেই তাকে জাগতে হলো এই খবর শুনবার জন্য যে এখানে আছে এক দুর্গ, সে-দুর্গের কাউন্টের অনুমতি ছাড়া কেউ এখানে কাটাতে পারে না রাত। কিন্তু সত্যিই কি জেগেছিল কে.? জেগে-ছিল জোসেফ বা গ্রেগর? না কি এর সবই কেবল তাদের ঘুমের মধ্যে খুলে যাওয়া, তল থেকে আরো অতলের দিকে চলে যাওয়া কেবলই? শুরু হবার পর 'দি মেটামর্‌ফসিস' 'দি ট্রায়াল' বা 'দি ক্যাস্‌ল্'-এ যে ঘটনাবলির দিকে এগোতে থাকে চরিত্রগুলি, সে কি জাগরণে না স্বচ্ছ কোনো ঘুমেরই পৃথিবীতে?

কাফ্‌কার প্রধান প্রায় সমস্ত লেখার মধ্যে দেখতে পাব ও-রকমই-সব শয়ান ভঙ্গি, ঘুম থেকে ভিন্ন কোনো জাগরণের দিকে পৌঁছবার যেন কোনো অলক্ষ্য দুয়ার। 'ইন দি পেনাল কলোনি' নামের বড়ো গল্পটিতে যে অভিযুক্তের কথা আছে—আর কাফ্‌কার মুখপাত্র তো প্রায় সবসময়েই না-জানা কোনো অভিযোগে জড়ানো, সে জানে না কী তার অপরাধ, সে জানে না কার কাছে কোন্ শাস্তি নিতে সে চলেছে—সেই অভিযুক্তেরও একটা শাস্তিবিবরণ ছিল শয্যাপ্রতিমাতেই বাঁধা। পশমমোড়া বিছানায় নগ্ন হয়ে অধোমুখী শুয়ে আছে সে, হাত-বাঁধার পা-বাঁধার ঘাড়-বাঁধার অনেকরকম দড়ি চারপাশে, কোনো সাড়াশব্দ করতে যেন না পারে তারও সব জবরদস্ত আয়োজন। এই অভিযুক্তকেও, ভুলতে পারি না আমরা, তুলে আনা হয়েছিল ঘুমেরই মধ্য থেকে, কেননা নির্দিষ্ট ভূমিকায় এসে এখানে ঘুমোবার কোনো অধিকার ছিল না তার।

ঘুম অথবা স্বপ্নের এইসব আস্তরণের মধ্যে কাফ্‌কা তৈরি করে নেন তাঁর গল্প বলার এক বাস্তবাতীত রীতি। কিন্তু এতই সন্তর্পণ তাঁর এই আস্তরণের মধ্যে চলে

যাওয়া যে আমরা ধরতেও পারি না কখন এক অবিশ্বাস্য শ্বাসরোধী অস্তিত্বের ভিতরে ডুবে আছি, যা একই সঙ্গে স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক। স্বপ্ন যেমন তরল হয়ে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে, একের সঙ্গে অন্যে জড়িয়ে গিয়ে যেমন বহুবর্ণিল হয়ে ওঠে স্বপ্ন, ভাঙা আর উতরোল, যুক্তিকাঠামোর বিন্যাসটাকে ভেঙে ফেলতে থাকে কেবলই, তেমন কোনো বিপর্যস্ত স্বপ্নরীতি কাফ্‌কার নয়। বরং স্ফটিককঠিন চিন্তার আদলেই তিনি এগিয়ে নিতে চান পাঠককে, যেন জেগে আছেন এই ভঙ্গিতেই স্বপ্নপ্রদেশের মধ্য দিয়ে কঠোর পথচলার কোনো আহ্বান তাঁর। আর এইভাবেই তিনি খুঁড়ে আনতে চান জীবনের মর্ম, যে-জীবন যেন কোনো ঊর্ধ্বগামী নদীর মতো, ডায়েরিতে একবার যেমন লিখেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন, স্বপ্নের মতো এই অন্তর্জীবন চিত্রিত করে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তাঁর।

স্বপ্নের মতো এই অন্তর্জীবন আর তাঁর গল্পবলার এই স্বপ্নরীতি, এর মধ্যে কখনো কখনো কি একাকার হয়ে মিশে যায় তাঁর নিজেরও অনেক স্বপ্নকথা? কে.

অথবা জোসেফ কে. যে এক হিসেবে কাফ্‌কা নিজেই, সে-কথা তো বলারও অপেক্ষা রাখে না, 'দি ক্যাস্‌ল' রচনার প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে 'কে'র বদলে 'আমি'ই তিনি লিখেছিলেন প্রথমে, নিজেকে নিজের বাইরে থেকে দেখবার গরজেই পরে আনতে হয়েছিল প্রথম পুরুষ, আনতে হয়েছিল স্বপ্নের মতো দ্রষ্টা ও দৃশ্যের একত্ব অথচ দ্বিধাচ্ছিন্নতা। এই একত্বে, কাফ্‌কার ঘুমে-পাওয়া স্বপ্ন, তাঁর নিজের অবতলকে জানবার অভিজ্ঞতা, কখনো কখনো হয়তো প্রত্যক্ষভাবেও কাজে লেগেছিল তাঁর।

মনে করা যাক 'দি ট্রায়াল' রচনার শেষ অংশটুকু। অনেক খাড়াই পথ বেয়ে জোসেফ চলেছে তার সঙ্গী-দুজনের মাঝখানে, শহর ছাড়িয়ে তারা এসে পৌঁছেছে এক খোলা প্রান্তরে, ত্যক্ত নির্জন এক বাড়ির লগ্ন পাথরখণ্ডের পাশে। সঙ্গীরা খুলে নিল তার কোট, তার জামা। ঠাণ্ডা হাওয়া, চাঁদের আলোয় স্নিগ্ধ-গম্ভীর চারপাশ, সরে যায় একজনের অঙ্গাবরণ, খাপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে লম্বা সরু ধারালো এক ছুরি। জোসেফের মাথার উপর দিয়ে হাতে হাতে

দুজন চালাচালি করছে সেই ছুরি, সে বুঝতে পারছে তাকেই ধরতে হবে ওটা, কিন্তু পারছে না ধরতে। আর ঠিক সেই সময়ে, পাশের বাড়ির ওপরতলায় চোখ পড়ল তার, মনে হলো কোনো আলো, একটা জানলা গেল খুলে, আবছা কোনো মূর্তি যেন ঝুঁকে পড়ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে হাত। কে ওখানে? কোনো বন্ধু? সহায় কেউ? সে কি অদৃশ্য কোনো বিচারক? কোথায় তার আদালত? আঙুলগুলি শূন্যের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে জোসেফ তুলে ধরল তার হাত, এল না কোনো সহায়, আর তখনই ছুরি এসে বিঁধল তার বুকে, এক-বার, আরো, আরো একবার।

অসম্ভব নয় যে গল্পের এ-অংশ পড়তে পড়তে আমা-দের মনে করতে ইচ্ছে হবে কাফ্‌কার একাধিক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত। অসহায়তা, ত্রাণেচ্ছা, আক্রান্ত আর আক্রাম-কের ছবি, এসব প্রতিমায় ভরে থাকে তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু সাধারণ সেই ছবিগুলি মাত্র নয়, কখনো কখনো প্রায় যেন এই 'ট্রায়াল'-এরই ছক দেখা দিতে থাকে কাফ্‌কার ডায়েরিতে, তাঁর নানা স্বপ্নের প্রতিচ্ছায়ায়। স্বপ্ন দেখেছিলেন একদিন, ঘর থেকে বেরোতেই সঙ্গীরা

বলছে 'ওটা কী তোমার পিছনে?' মাথার পিছনে হাত দিয়ে দেখা গেল জেগে আছে একটা তরোয়ালের বাঁট। ঘিরে ধরল সবাই, খুলে নিল তাঁর জামা, খাপ থেকে তুলে আনবার মতো তাঁর পিঠের চামড়া আর মাংসের মধ্য দিয়ে আলতো করে তুলে আনল গেঁথে-থাকা সেই দীর্ঘ প্রাচীন তরবারি, হাস্যভরে এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। এর সঙ্গে জুড়ে নিয়ে ভাবতে পারি কাফ্‌কার আরেকদিনের স্বপ্ন, যখন তিনি দেখছিলেন যেন চলেছেন তাঁর বাবার সঙ্গে কোথাও। এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার বাইরে, সামনে এক বিরাট দেয়াল, বাবা উঠে গেলেন যেন নাচের ছন্দে, কিন্তু সাহায্য করলেন না তাঁকে একবিন্দুও। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চাইছেন তিনি, দেয়ালটা হয়ে উঠছে খাড়াই থেকে আরো খাড়াই, অবলম্বন নেই কোথাও। কিংবা আরেকদিন: জানলার কার্নিশে ঝাঁপিয়ে উঠছেন বাবা, হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে চলেছেন তার উপর, যেন তাঁর বাথরোবের প্রান্ত ধরে উঠতে চাইছেন কাফ্‌কা, কিন্তু বাবা যেন রূঢ়তায় কেবলই সরে যাচ্ছেন দূরে।

'দি ট্রায়াল'-এর প্রাথমিক খসড়াটা একদিন শুরু হয়েছিল এইভাবে এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে, জোসেফ কে., বাবার সঙ্গে একদিন তুমুল ঝগড়ার পর নিরুদ্দেশ বেরিয়ে পড়ে পথে, ক্লান্ত, দিশেহারা। কিংবা, 'দি জাজমেণ্ট' গল্পে মূল কথাটা জুড়ে আছে বাপছেলের দ্বন্দ্বে, গেয়র্গকে তার বাবা শেষ পর্যন্ত শাপ দেন ডুবে মরার, মরেও সে। আর 'আমেরিকা'য় কার্ল রসমানকে ঘরছাড়া করেন তার বাবা ষোলো বছর বয়সে। আকস্মিক নয় এসব পুনরাবর্তন, কাফ্‌কার নিজেরই গার্হস্থ্য সম্পর্কের আভাস মেলে এসব প্রয়োগে, যে-সম্পর্কের ঊষরতায় বাবাকে তিনি দেখতে পান শুধু অত্যাচারী এক বুরোক্র্যাটের মূর্তিতে, যে-সম্পর্কের ক্ষতময়তায় বাবাকে তিনি লিখতে পারেন ক্ষোভে : 'আমার সব লেখাই আপনাকে নিয়ে।' আর অন্যদিকে, ঈশ্বরহীন ধর্মাতুর কাফ্‌কার জীবনের পরম বিচারক যদি থাকেন কোথাও, তিনিও আসেন ওই একই বুরোক্র্যাটের আদলে। কাফ্‌কার সেই অমেয় অদৃশ্য বিচারক, বিড়ম্বনাময় তাঁর পিতৃমূর্তি আর 'দি ট্রায়াল'-এর মতো কাহিনীর দূরস্থায়ী অনিচ্ছুক দোলা-

য়িত হাতগুলি একাকার হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত, ভিতরে ভিতরে একান্ত হয়ে মিলে যায় তাঁর স্বপ্ন তাঁর জীবন তাঁর শিল্প।

কিন্তু এই যে কেবলই এক অবিচারের অত্যাচারের আক্রমণের আর্তনাদ, জীবনকে এ কি কোনো দমবন্ধ হতাশ্বাসের দিকেই ঠেলে দিতে থাকে শুধু, কেবলই কোনো না-এর দিকে? ডায়েরিতে কাফ্‌কা অবশ্য বলেছেন যে তিনি কেবল তাঁর সময়ের না-এরই প্রতিনিধি, শতাব্দীসূচনার ভয়াল এক ক্ষয়ের সময়কেই তিনি ছুঁয়েছিলেন তাঁর চেতনার তীব্র ঝলকে, তাঁর নিজস্ব ফুসফুস আর স্বরযন্ত্রের হন্তারক ক্ষয়কেও ভেবে নিয়েছিলেন যেন কোনো প্রতীক, ভুবনের সমস্ত গ্লানির অন্তঃসারকে তিনি আপাত-আয়াসহীনতায় তুলে এনেছেন সুনিশ্চিত হাতে। তবু আমাদের মনে পড়ে তাঁর দ্বিধার কথা, মনে পড়ে 'দি মেটামর্‌ফসিস' লিখবার কিছুদিন পর ও-গল্প বিষয়ে তাঁর এই আত্মধিক্‌কার : 'মজ্জায় মজ্জায় অপরিণত! শেষটা তো অপাঠ্য একেবারে!' কিংবা, ভাববার মতো হয়ে থাকে এই কথা যে মৃত্যুর আগে বন্ধু মাক্স ব্রডের কাছে

লিখে গিয়েছিলেন তিনি, অপ্রকাশিত তাঁর সমস্ত রচনা যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। ভাবতেও ভয় হয় বন্ধু যদি মানতেন তাঁর নির্দেশ, কেননা সেই অপ্রকাশের মধ্যেই ছিল 'দি ট্রায়াল' 'দি ক্যাস্‌ল'-এর মতো রচনাগুলিও! নিজের রচনা বিষয়ে কাফ্‌কার প্রত্যয় যে কিছু কম ছিল তা নয়, সাহিত্য তো ছিল তাঁর কাছে সুখ আর পূর্ণতার দ্যোতক, তবু কেন ওই মর্মান্তিক নির্দেশ তিনি রেখেছিলেন তাঁর বন্ধুর জন্য? মাক্স ব্রডের অনুমান, কোনো কোনো ব্যক্তিগত দুরভিজ্ঞতার আঘাত তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল অগাধ শূন্যতার বোধে, তাই এই ঔদাস্য। আর তাছাড়া, রচনার জন্য এমন পরম একটা মান স্থির করেছিলেন তিনি, যা তিনি ছুঁতে পারেননি বলে ভাবতেন কেবলই। ব্রড অবশ্য লক্ষ করেননি যে তাঁর বলা প্রথম আর দ্বিতীয় কারণের মধ্যে একটা বিরোধই বুঝি থেকে যায়, কিন্তু সে-কথা ছেড়ে দিলেও ভাবতে হয় যে এই 'পরম মান'-এর অভাব যদি সত্যি হয় তো কোন্ দিক থেকে সে-অভাব লক্ষ করেছিলেন কাফ্‌কা।

এর কোনো সুস্থির উত্তর আজ আর কেউ বলতে

পারেন না নিশ্চয়, আজ আমরা কেবল অনুমান করতে পারি কোনো কোনো ভাষ্য, অনুমান করতে পারি কাফ্‌কারই ডায়েরির নজিরে। 'নিজেকে খুলে দাও তবে। বেরিয়ে আসুক মানুষটা। শ্বাস নাও বাতাসে আর নীরবতায়'—নিজেকে তিনি বলেন একদিন। নিজেকে স্বজনহীন পরিত্যক্ত বিচ্ছিন্ন নির্বাসিত নিরাশ্বাস বলে ভাবতে ভাবতেও তাঁর মনে পড়ে মানবিক পৃথিবীর টান, যে-টান তাঁকে ভুলিয়েও দিতে চায় সব। তিনি কি কোনো ভিন্ন পৃথিবীতে বেঁচে আছেন, নিজের মুদ্রাদোষে? এ-কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই কাফ্‌কার মনে পড়ে কীভাবে তাঁর মা তাঁকে আবৃত করে রাখেন সমস্ত ছিন্নতার বেদনা থেকে, মনে পড়ে যে এই কৃতজ্ঞতাও এক জীবন! তাঁর পতনের কারণ কি তাঁর আত্মকেন্দ্রিকতা, নিজেকে নিয়ে তাঁর অবিরল উদ্‌বেগ শুধু? ঊর্ধ্বতর কোনো আত্মিকতার জন্য আকূতি কি নেই কোথাও? এই প্রশ্নে কেবলই তিনি জর্জরিত করেন নিজেকে। আর এইসব দ্বন্দ্বের ক্ষোভের চিহ্ন দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছই ফেলিসকে লেখা তাঁর উপান্ত্য এই চিঠিটিতে : আমি যে কেবল কোনো

পরম বিচারের দাবিপূরণের জন্য ছুটছি তা নয় ; বরং ঠিক উলটো। আমি জানতে চাই সমস্ত মানবজগৎ, সমস্ত প্রাণীজগৎ, বুঝতে চাই তাদের মৌল বাসনা, তাদের নৈতিক আদর্শ, সহজ নিয়মের মধ্যে ভরে আনতে চাই তাকে, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপন আচরণকে করে তুলতে চাই সেইমতো যাতে সমস্ত পৃথিবীর চোখে পেতে পারি প্রসাদ।

এই চিঠিতে, বিশ্ব থেকে ছিন্ন না হয়েও নিজের অন্তর্মূল থেকে জীবনমর্মে পৌঁছবার যে আবেগ দেখা দিয়েছিল কাফ্‌কার মনে, তার সমগ্রতার বোধটাই রচনায় আসছিল না বলে কি ভাবছিলেন তিনি? তাঁর সৃষ্টি এক সত্য শুদ্ধ সত্তায় তুলে আনবে পৃথিবীকে, এরই আকুল ইচ্ছেয় তাঁর জীবন আর স্বপ্নের মধ্যে— মানবীয় পন্থা আর তুরীয় পন্থার মধ্যে— যে সামঞ্জস্য হয়তো খুঁজে ফিরছিলেন তিনি, শেষ পর্যন্ত তা অস্পৃশ্য থেকে গেল বলেই কি মনে হচ্ছিল তাঁর? সেজন্যই কি লেখাগুলি বিষয়েও এত তাঁর অতৃপ্তি? এসব জল্পনার বড়ো আর মানে নেই আজ, কিন্তু পাঠক হিসেবে তবু আমাদের ভাবতে হয় যে পরমের স্বপ্নে বিদ্ধ এই

কাফ্‌কার রচনা থেকে কোন্ প্রতিমাটি আমাদের সামনে শেষ পর্যন্ত ধ্রুব ইশারা হয়ে জেগে থাকবে : আততায়ীদের সামনে মুমূর্ষু জোসেফের উচ্চারিত শেষ আত্মবেধ 'ঠিক যেন এক কুকুর', না কি অজানা আদালতের দিকে উঠে যাওয়া ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ভঙ্গুর তার স্পন্দিত সেই আঙুলগুলি ? এরই উত্তরের উপর নির্ভর করবে আজ আমাদের কাফ্‌কা পড়বার ধরন। এরই উত্তরের উপর নির্ভর করবে তাঁর স্বপ্নকে আজ বুঝতে পারা আর না-পারা।

এ কি হতে পারে যে সত্যিকারের জানবার মতো জরুরি কথাগুলি জানাই হয়নি এখনো, দেখাও হয়নি বলাও হয়নি আজও? এ কি হতে পারে যে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ কেবল দেখেছে ভেবেছে লিখেছে অথচ অবহেলায় গড়িয়ে যেতে দিয়েছে দীর্ঘ এই সময়টাকে? কাতর এই প্রশ্ন তুলেছিলেন রিল্‌কে তাঁর 'মাল্টে' বইটির মধ্যে, এই এবং এ-রকম আরো, আর বারে বারে বলেছিলেন: হ্যাঁ, হতে পারে সেটা। আর হতে পারে বলে তাঁকেই আজ ছুঁতে হবে জীবনের মূল প্রশ্নগুলি। যত তরুণ এবং তুচ্ছই হোন না কেন তিনি, মাল্টেকে আজ শুধু লিখে যেতে হবে, লিখতে হবে দিনরাত, এই তাঁর ভবিতব্য।

কিন্তু কী তিনি লিখবেন? কীভাবে? একটা সময় আসবে, মনে হয় তাঁর, যখন তাঁর নিজের হাত যেন নিজের থেকে দূরের হয়ে যাবে, আর এমন-সব শব্দ ভেসে আসতে থাকবে যা লিখবার হয়তো কোনো ইচ্ছে ছিল না তাঁর। একটা শব্দের অনুসরণে আসবে না অন্য শব্দ, সমস্ত অর্থ যেন একের মধ্যে অন্যে মিলিয়ে

যাবে মেঘের মতো আর ঝরে পড়বে বৃষ্টি হয়ে। এই কথাগুলি হয়ে উঠবে লেখার টেবিলের সামনে মাপ্টের নতজানু আর্তনাদ: 'সবার থেকে সরে এসে, নিজেরও থেকে সরে এসে, নিজেকে আমি মুক্ত করতে চাই একান্ত মনে, আর রাত্রির এই নীরব বিজনে নিজেকে নিয়ে গর্বও করি একটু। যাদের আমি ভালোবেসেছি, যাদের গান আমি গেয়েছি, তাদের আত্মা আমাকে শক্তি দেয় সমর্থন দেয়; আমাকে তারা সরিয়ে রাখে মিথ্যে থেকে আর পৃথিবীর বিষবাষ্প থেকে; আর, তুমি, হে আমার ঈশ্বর! দাও আমাকে এমন কয়েকটি মহৎ কবিতা লিখবার প্রসাদ, যাতে নিজেকে আমি বোঝাতে পারি আমি ন্যূনতম মানুষ নই, যাদের ঘৃণা করি তাদেরও চেয়ে নিচু নই আমি।'

লিখতে হবে মহৎ কয়েকটি কবিতা। কিন্তু সে তো খুব অনায়াস কোনো ঘটনা নয়, কতদিনের কত আয়োজন চাই তার জন্য। একথাও মনে হয় মাপ্টের, আঠাশ বছর বয়স হয়ে গেল, কিছুই কি লেখা হলো এর মধ্যে? কতদিনের কত অপেক্ষা চাই সামান্য একটু সৃষ্টির জন্য? সারা জীবন, সারা দীর্ঘ জীবনের অপেক্ষার

পর হয়তো অন্তিমে গিয়ে লিখতে পারে কেউ দশটি মাত্র ভালো লাইন। কবিতা তো কেবল আবেগ জাগানো নয়, কবিতা হলো অভিজ্ঞতা। একটি কবিতা লিখবার জন্য দেখতে হয় কত শহর, কত মানুষ, কত বস্তু; জানতে হয় কত জীব, কত পাখির উড়াল, সকালের দিকে খুলে-যাওয়া ছোটো ছোটো ফুলের কত ভঙ্গি। ফিরে যেতে হয় অচেনা দেশের নানা পথে, আশাতীত কত দেখাশোনায়, অবশ্যম্ভাবী কত বিচ্ছেদে, কত অস্পষ্ট শৈশবদিনে, অসুখের দিনে, শান্ত আর নিভৃত কোনো ঘরে, সমুদ্রের পাশে সকালের আলো, তারার সঙ্গে উড়ে যাওয়া কত নৈশ ভ্রমণ। মনে করতে হয় কত-না ভালোবাসার রাত, একের চেয়ে একেবারে ভিন্ন আরেকটি। বসতে হয় তাকে মুমূর্ষুর পাশে, জানলাখোলা ঘরে কোনো মৃতের পাশে। চাই এই সবকিছুর সমবেত স্মৃতি, আবার এসব ভুলে যাবারও ক্ষমতা থাকা চাই। যখন রক্তের মধ্যে একেবারে মুছে যাবে এসব, একটির থেকে অন্যটিকে ভিন্ন করে চেনা যাবে না আর, তখনই এসে পৌঁছতে পারে দুর্লভতম কবিতার মুহূর্ত!

এই যে এক মহৎ আর দুর্লভ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা স্তম্ভিত হয়ে আছে 'মাল্টে' বইখানির মধ্যে, 'মাল্টে' প্রকাশের অল্প কিছুদিন পরে 'ডুইনো এলিজি'র মধ্যে যেন দেখা গেল তারই এক আকস্মিক উদ্ভাস। আঠাশ বছরে কিছু হয়নি বলে আক্ষেপ করেছিলেন মাল্টে, পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে যাবার পর সে-আক্ষেপের হয়তো আর কোনো কারণ ছিল না রিল্‌কের। এত-দিনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, তাঁর দেখা এবং দর্শন ঘন হয়ে এসে রূপ নিল তাঁর দশ পর্বের ওই মহাগীতিকাব্যে। ডুইনোর দুর্গপ্রান্তে হঠাৎ তাঁর চেতনায় বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল কয়েকটি শব্দ, হঠাৎ তাঁর সামনে যেন আবির্ভাব হলো কোনো দেবদূতের, আর সেই মুহূর্তটি থেকে গড়ে উঠল এই শতাব্দীর মহৎ সৃষ্টিগুলির অন্যতম একটি। দশটি এলিজি সম্পূর্ণ করে তুলতে দশ বছর সময় লাগবে তাঁর, ১৯২২ সালের আশ্চর্য একটি বছরে পৃথিবীর সামনে এসে পৌঁছবে প্রুস্ত আর এলিয়ট আর রিল্‌কের যুগন্ধর বই কখানি, কিন্তু এই সবেরই সূচনা ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দু-এক বছর আগে। মাল্টে যাকে ভেবেছিলেন রক্তে মিশে যাওয়া প্রস্তুতি,

তার সবটাই যেন ঘটে গেছে তখন রিল্‌কের জীবনে, তাঁর এলিজিগুলির মধ্যে এসে মিশে গেছে তাঁর জীবন আর মৃত্যু বিষয়ের এক সর্বাঙ্গীণ বোধ। সামগ্রিক সেই বোধের এক প্রতীক হয়ে আসে এলিজির দেবদূত বা Angel।

প্রায় সমবয়সী আরেকজন কবি, ওয়ালেস স্টীভেন্‌স্, ভিন্ন দেশে বসে লিখেছিলেন তাঁরও এক দেবদূতের কথা, যিনি এসে বলবেন 'I am the angel of reality'। স্বাগতম্ টাঙানো আছে যে দরজায়, সেখানে এসে কি পৌঁছবে না কেউ? মুহূর্তের জন্য হয়তো-বা সেখানে দেখা যায় এই angel-কে, তারপর আবার সব শূন্য। 'আমারই দেখায় তুমি দেখো, আমারই শোনায় তুমি শোনো,' বলেন সেই দেবদূত। বলেন, কিন্তু বড়ো ক্ষণিক তাঁর অস্তিত্ব, মনের খোলা দরজার সামনে অল্প সময়ের জন্যই এসে দাঁড়ান তিনি : Seen for a moment standing in the door!

ঘর আর দুয়ারের এই ছবিগুলির মধ্য দিয়ে— অপেক্ষা, পাওয়া আর পেয়ে হারানোর এই ছবিগুলির

মধ্য দিয়ে—কিংবা চলাচলের এই ছবিতে—আমরা মনে করতে পারি রবীন্দ্রনাথেরও নাম, ঘরের সামনে দিয়ে চকিতে চলে যাওয়া তাঁর রাজার দুলালের কথা, তাঁর 'খেয়া' বা 'গীতাঞ্জলি'র কোনো কোনো কবিতা। একেবারে আক্ষরিক এক নয় বটে এইসব প্রতীকের তাৎপর্য, কিন্তু গূঢ় একটা ঐক্য আছে কোথাও। রিল্‌কে বা রবীন্দ্রনাথ বা স্টীভেন্‌স্‌ এইসব ছবির মধ্যে দিয়ে আমাদের পৌঁছে দিতে চান কোনো এক অন্তর্গত সত্যের ধারণায়। রূপ-রূপাতীতের সংঘর্ষ থেকে কঠিন কোনো জীবনসত্যকে বুঝে নিতে চেয়েছিল 'চতুরঙ্গ'র শচীশ, শ্রীবিলাসের কাছে হঠাৎ সে বলতে পেরেছিল, 'আমি কবি'। বিশ্বচলাচলের সত্যকে আবিষ্কার করে নেওয়া তো কবিরই দায়িত্ব! 'একটা পৃথিবী গড়ে তোলেন কবি, আমাদের অজ্ঞাতেই আমরা এগিয়ে যাই তার দিকে,' বলেছিলেন স্টীভেন্‌স্‌, তাঁর 'The Necessary Angel'-এ। বলেছিলেন, 'আমাদের ভিতরকার সেই পৃথিবী যদি না থাকত, তবে মিথ্যে হয়ে যেত আমাদের চারিদিকে বাইরের এই পৃথিবী।' বলেছিলেন আরো: 'ঈশ্বরে বিশ্বাস ছেড়ে দেবার পর মানুষ তার মুক্তি

খুঁজে পায় কবিতার সারাৎসারে। কবি হয়ে ওঠেন অদৃশ্যের যাজক।'

এক হিসেবে, রিল্‌কের দেবদূতও এই অদৃশ্যেরই যাজক। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি আমাদের প্রকৃতি-তে ; আমাদের আকাঙ্ক্ষা আর যোগ্যতা, আমাদের ভাবনা আর কাজ, আমাদের আদর্শ আর বাস্তব মিলতে চায় না কোনো সামঞ্জস্যে। কিন্তু কোনো এক শক্তি কি নেই যার মধ্যে এই বিপরীতের সাষ্টাঙ্গ মিলন ঘটে গেছে ? দৃশ্য জগতের বাইরে এক অদৃশ্য মণ্ডল ছড়িয়ে আছে আমাদের চেতনায়। কোনো এক শক্তি কি নেই যা মুহূর্তমধ্যে এই দৃশ্যে-অদৃশ্যে ভিন্নতা লোপ করে দিতে পারে, দৃশ্যেরই মধ্যে এনে দিতে পারে অদৃশ্যের দ্যুতি ? সেইটেই তো অন্তর্গত পৃথিবীর কাজ আর সেই অন্তর্গতের সম্পূর্ণ শক্তি রয়ে গেছে শুধু এক দেবদূতের মধ্যে। দৃশ্যজগৎকেই আমরা একান্ত সত্য ভেবে জড়িয়ে থাকতে চাই বলে এই দৃশ্যাতীতের আহ্বান কাঁপিয়ে তোলে না আমাদের, সহজে আমরা সইতে পারি না তার আবির্ভাব। কিন্তু রিল্‌কে ভেবেছিলেন, 'মানুষের দৃষ্টি দিয়ে নয়, এই দেবদূতের

মধ্য থেকেই পৃথিবীকে দেখা হয়তো আমার প্রকৃত কাজ।'

দেবদূতের এই পরম চেতনাকে ক্ষীণ মানুষ তার আয়ত্তের মধ্যে পায় না বলে কিছু কি করবার নেই তার? তখনই আসে প্রতীক্ষার কথা, প্রস্তুতির কথা, লগ্নতার কথা। জীবনের ছিন্ন মুহূর্তগুলি গড়িয়ে যায় অনিশ্চয়ের দিকে, অর্থহীনতার দিকে, তুচ্ছতার দিকে। কিন্তু, হয়তো আমরা কেবলই আমাদের প্রস্তুত করে রাখতে পারি, বহু যত্ন করে, ধুয়ে মুছে রাখতে পারি মনের মাঝখানে একখানা ঘর, যাতে অপচীয়মান মুহূর্তগুলির মধ্যে হঠাৎ কখনো ছুঁয়ে যেতে পারি অন্তহীনকে। রিল্‌কে বলবেন, এই প্রস্তুতিই হলো ভালোবাসা, এই প্রস্তুতিই আমাদের হয়ে-ওঠা।

দৃশ্য আর অদৃশ্যের এই ভাবনা তাই অনিবার্য-ভাবে আমাদের পৌঁছে দেয় জীবন আর মৃত্যুর ভাবনায়। বোঝা যায়, কেন 'মাল্টে'র একেবারে প্রথম লাইন হবে এই প্রশ্ন 'লোকে তাহলে এখানে বাঁচবার জন্য আসে? আমি বরং ভাবতাম যে মৃত্যুর জন্যেই এখানে আসে তারা।' ডুইনো এলিজির

পোলিশ অনুবাদকের কাছে রিল্‌কে লিখেছিলেন একটি চিঠিতে : 'এলিজিগুলিতে একাকার হয়ে আছে জীবনের স্বীকৃতি আর মৃত্যুর স্বীকৃতি। এখানে আমাদের যে-অভিজ্ঞতা, যে-উদ্‌যাপন, সেইভাবে যদি এর একটিকে ছেড়ে অন্যটির কথা ভাবি শুধু, তাহলে এর সীমাবদ্ধতা আমাদের সরিয়ে দেয় অনন্ত থেকে দূরে। মৃত্যু হলো জীবনের সেই দিকটা যা আমাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে আছে, যার উপর আলো ফেলিনি আমরা। আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড়ো চেতনায় পৌঁছতে চাই আমরা, সে-চেতনা একই সঙ্গে আশ্রয় পায় এই দুই বাধাবন্ধহারা দেশে।··· এপার বলে কিছু নেই, ওপার বলে কিছু নেই, আছে কেবল এক মহান্ ঐক্য, আর সেই পরমতায় আছেন আমাদের উত্তীর্ণ-হয়ে-যাওয়া দেবদূতেরা।'

মৃত্যু, রিল্‌কের ভাবনায়, অস্তিত্বের কোনো অবসান নয় তাহলে, যেন সেটা কোনো মানবোত্তীর্ণ অস্তিত্বও নয়। মৃত্যু যেন জীবনেরই চলমান এক স্তর। সেইভাবে দেখলে মানুষ তার মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে নিজেরই অন্তর্গত বলে জানতে পারে একদিন। যে-কোনো

মানুষের মৃত্যু যেন আমারই এক-টুকরো মৃত্যু, জীবন যে অন্তিমের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে তার প্রস্তুতি হতে থাকে যেন এইসব মৃত্যুধারার মধ্য দিয়ে। মৃত্যু তখন আর ভয়ংকর হয়ে দেখা দেয় না রিল্‌কের কাছে, সেটা হয়ে দাঁড়ায় জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা মাত্র।

কেউ বলতে পারেন অবশ্য—বলেওছেন একজন (Guardini)—যে, মৃত্যুকে এই ভয়হীনভাবে দেখবার বুঝবার যে আকুল চেষ্টা রিল্‌কের, সে তো তাঁর মৃত্যু-ভয়েরই এক প্রমাণ? এক হিসেবে কথাটার মানে আছে নিশ্চয়। কিন্তু তখন মনে রাখতে হবে যে অনিবার্য সেই ভয়ের সামনেই চেতনাশীল মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়ে তোলেন তাঁদের প্রতিরোধ, তাঁদের দার্শনিক মননে, তাঁদের শিল্পের সৃষ্টিতে, তাঁদের সামাজিক কাজে। সেই প্রতিরোধের আয়োজনেই কবিতার ভিতরে জীবনমৃত্যুকে এমন ঐক্যময় দেখবার সাধনা করেছিলেন রিল্‌কে, বা 'মাল্টে'তে যেমন লিখেছিলেন একবার: 'ভয়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যই সারারাত ধরে লিখতে হবে আমাকে!' লিখতে হলো তাঁকে অবিশ্রাম প্রস্তুতিতে কয়েক বছরের মধ্য দিয়ে,

আর সেসব লেখায় জীবনকে নিয়ে বিলাপই যে শুধু জেগে রইল এমন নয়, তাঁর এলিজিগুলিতে ক্রমশ আমরা ছড়িয়ে যাই বিলাপ থেকে আনন্দে, অস্তিত্বেরই জয়ঘোষণায়। আর তখন মনে হয়, জীবনমৃত্যুর দৃশ্য-অদৃশ্যের এই সমগ্রকে মিলিয়ে নেওয়া তাঁর রচনাও যেন হয়ে উঠছে পরিচ্ছন্ন বাতাসের মধ্যে সুদূর সেই ঘণ্টাধ্বনির মতো, মাল্টে একদিন যা শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর নিজের প্রিয় কবির রচনায়।

—